সমরেশ মজুমদার

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মন্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪

ব্লক
স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মন্ডল
ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬ ।

শয়তানের চোখ

কার্তিক মাসেই বৃষ্টি বন্ধ হয়েছিল। এই তল্লাটে বৃষ্টি একবার নামলে আর থামতেই চায় না। পড়ছে তো পড়ছেই। ভিজে ঘাসের বুকে চপ-চপে জল ছাড়া পথে কোনও বাধা থাকে না বটে, কিন্তু জোঁক বেরোয় কিলবিলিয়ে। চতুর্দিকে চা-গাছের বাগান আর শিরীষ গাছের জঙ্গল ভিজে ঢোল হয়ে জোঁক বুকে নিয়ে বসে থাকে। কখনও আশ্বিনের শেষ, কখনও কার্তিক অবধি ব্যাপারটা গড়ায়।

এখন তো বৈশাখ মাস। অনেক দিন পৃথিবীটা খটখটে। চা-বাগানের রাস্তায় গাড়ি চললেই মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে। পেছনে তাকালে ব[illegible] ছ্যাঁত করে ওঠে। যেন বিশাল ধুলোর ঝড় তেড়ে আসছে অন্ধকার করে। গুপি ড্রাইভার বলে জানলার কাঁচ খোলা রাখতে। তাতে নাকি ধুলো গাড়িতে না জমে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যুক্তিটা মোটেই ভালো লাগে না সায়নের। জানলা দরজা বন্ধ করে গাড়িতে বসে থাকলেও একটা ধুলোটে বাতাস ঢুকে যায় ঠিকই, কিন্তু যেচে ওই ধুলোর ঝড়টাকে ঢোকানোর কোনও মানে হয় না। সুপ্রকাশ কিন্তু গুপিকেই সমর্থন করেন। তিনি যখন গাড়িতে থাকেন, তখন জানলা বন্ধ হয় না। তা যাই হোক, চৈত্র মাস এলেই সারা বাগানটা ধুলোয় ধুলোয় সাদা হয়ে যায়। জলবিহীন পাঁচ মাসের পর মাটি উড়তে থাকে যেন। যদিও এখানে গরম পড়ে না তেমন। তাতেই এই অবস্থা।

সায়নদের বাংলোটা সত্যিই সুন্দর। কাঠ আর সিমেন্ট মিলিয়ে দোতলা বাংলোটায় আধুনিক জীবনের সমস্ত আরামের ব্যবস্থা আছে। বিশাল, সুন্দর করে ছাঁটা, ঘাসের লনের পাশে কেয়ারি করা ফুলের বাগান। গেটে একজন পাহারাদার সব সময় মজুত। বাগান পেরিয়ে চকচকে বারান্দায় পা দিতেই চমৎকার বসবার চেয়ার-টেবিল নজরে আসবে। সবই চা-গাছ কেটে তৈরি। তাদের ডিজাইন হয়তো পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

সুপ্রকাশের আবিষ্কার ওই সব।

বাংলোটায় আটখানা ঘর। সেগুলো দেখাশোনার ভার দুজন মানুষের ওপর। এই দুজনকেই সায়ন জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছে। একজন বুধুয়া— বুড়ো, কালো, খানিকটা কুঁজো, সাদা চুলের খুব নরম মানুষ। অন্যজন বকুল। বকুলের বয়স মাঝারি। অন্যান্য মদেসিয়া শ্রমিক মহিলাদের থেকে পোশাক এবং সাজগোজে আলাদা। এতকাল ওর ওপরই ছিল সায়নের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির দায়িত্ব। আর আছে দুজন দারোয়ান আর একজন ঠাকুর। চা-বাগানের মানুষরা এই বাড়িটাকে বলে বড় বাংলো। অন্তত সিকি মাইলের মধ্যে কোনও ঘরবাড়ি নেই। সরকারী ম্যানেজারের বাংলো পুব দিকে রেতি নদীর গা ঘেঁষে, আর স্টাফ কোয়ার্টার্স কিংবা কুলি লাইন ঠিক উত্তরে। বড় বাংলোর গেট পেরিয়ে মিনিট দশেক হাঁটলেই পাহাড় শুরু। এই পাহাড় ছোট থেকে বড় হয়ে এক সময় হিমালয় হয়ে গিয়েছে।

বড় বাংলোর দোতলায় দাঁড়ালে চা-বাগানের অনেকটাই দেখা যায়। সায়ন চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার স্কুল খুলতে এখনও পনেরো দিন বাকি। স্কুল খোলার আগের দিন তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। এইটেই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগের বার সে প্রচণ্ড কান্না-কাটি করেছিল। ছুটির শেষে এই চা-বাগান ছেড়ে চলে যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করে না। বুকের মধ্যেটা কী রকম থরথর করে ওঠে। সেই সময় বাবাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। এই চা-বাগানে ভালো স্কুল নেই বলে সত্তর মাইল দূরের এক পাহাড়ী মিশনারি স্কুলে থেকে পড়াশুনা করতে হয়। সায়ন মাথা নাড়ল। তার বয়স গতবারের চেয়ে একবছর বেড়েছে। এবার নিশ্চয়ই যাওয়ার সময় তার অতটা কষ্ট হবে না। তা ছাড়া যেতে তো এখনও অনেকদিন বাকি। বোকারাই আগে থেকে মন খারাপ করে বসে থাকে।

এইসময় নীলাম্বরকে দেখতে পেল সায়ন। ধুলোর ঝড় পেছনে রেখে চা-

াগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে। নীলাম্বর যত জোরেই ছুটুক, সুপ্রকাশ বসে থাকেন স্থির হয়ে। প্রয়োজনীয় সময়ে তার সামান্য নির্দেশই নীলাম্বরের কাছে অনেকখানি। গেট পেরিয়ে লনে ঢুকে ওপরের দিকে মুখ তুলে সুপ্রকাশ হাসলেন। এইটে খুব ভাল লাগে সায়নের। সে সিঁড়িগুলো টপকে টপকে পথটাকে ছোট করে ছুটে এলো লনে, সুপ্রকাশ তখন ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ধরিয়ে দিয়েছেন বুধুয়া-বুড়োর হাতে।

সায়ন আবদারে গলায় বলল, "বাবা, আমি ঘোড়ায় চড়ব!"

সুপ্রকাশ একবার দোতলার দিকে তাকালেন, তারপর মাথা নাড়লেন, "না খোকা, আজ বড্ড ধুলো। তা ছাড়া ছুটে ছুটে নীলাম্বর খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। অন্যদিন; অন্য সময়। সোনা আমার।" ওঁর হাতটা ছেলের মাথায় আলতো ছোঁয়ামাত্র টেলিফোনটা বেজে উঠল। বারান্দায় ঝোলানো রিসিভারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। সায়নের ঠোঁট দাঁতের তলায় চলে এলো। সে জানে অন্যদিন অন্যসময় আর একটা অসুবিধে সামনে এসে দাঁড়াবে। বাবা কখনই তাকে নীলাম্বরের পিঠে চেপে বাইরে ঘুরতে যেতে বলবেন না। অন্তত মায়ের ওই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর বাবা ইচ্ছে থাকলেও 'হ্যাঁ' বলতে পারেন না।

ফ্যাক্টরি থেকে জরুরি খবর এসেছিল। সুপ্রকাশ চটজলদি জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নীলাম্বরকে ব্যবহার করা হয় চা-বাগানের সরু পথে ছুটে যাওয়ার জন্যে অথবা রেতি নদীর গা ধরে পাহাড়ে ওঠার প্রয়োজনে।

চা-বাগান এদেশে তৈরি করেন ব্রিটিশরা। সেই সময় কিছু স্কচ্ সাহেবও এঁদের সঙ্গে জুটে যান। ডুয়ার্স আর আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নামমাত্র মূল্যে পেয়ে গেলেন ওঁরা চা-বাগান তৈরির জন্যে। তখন চা-শিল্পে কোনও ভারতীয় আসেন নি। কিংবা বলা যায়, ভারতীয়রা যাতে এই লাভজনক ব্যবসায়ে না আসেন তার জন্যে নানান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হতো। কিন্তু সত্যিকারের উদ্যোগী মানুষকে তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। জলপাইগুড়ির ঘোষ এবং রায় পরিবারের কর্ণধাররা সেই অসাধ্য সাধন

করেছিলেন। ব্রিটিশরা যে-সমস্ত জমি পাথুরে এবং চা-চাষের পক্ষে কষ্টসাধ্য বলে বাতিল করেছিলেন, তাতেই তাঁরা সোনা ফলান।
সুপ্রকাশের চতুর্থ পূর্বপুরুষ চারুপ্রকাশের হাতে তৈরি এই বাগান। এই মুহূর্তে সুপ্রকাশ যে-কোনও দক্ষ ম্যানেজারের মতনই উৎপাদন ও ব্যবসার কাজ দেখাশোনা করেন। এর জন্যে তাঁকে খাটতে হয় খুব। দিন রাতের কোন সময় তাঁকে কতটা বিশ্রাম দেবে, তা তিনি জানেন না। সায়ন দেখল, দূরে ধুলোর ঝড়টা বাবার সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছে। নীলাম্বর তার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বুধুয়াও নড়ছে না। সে যদি লনের মধ্যে চড়ে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু নীলাম্বরের পিঠে চেপে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করার কোনও মানে আছে? লাগাম মুঠোয় চেপে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেওয়ায় যে কী আরাম!
সায়ন এবার চোখ তুলতেই মিষ্টি হাসিটাকে দেখতে পেল। দোতলার বারান্দার গ্রিলের ফাঁকে কুমুদিনীর উজ্জ্বল মুখ। ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সায়ন আবার দৌড়াল। একটুও না থেমে মায়ের হুইল চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "জানো, বাবা আজও আমাকে নীলাম্বরের পিঠে চড়তে দিল না।"
সামান্য মেঘ বুঝি জমল কি জমল না, কুমুদিনী শান্ত গলায় বললেন, "হ্যাঁরে, বাড়িতে দুটো গাড়ি আছে, ছোট সাইকেল আছে, ওগুলোয় চড়তে বুঝি তোর একটুও ইচ্ছে করে না, না?"
সায়ন মাথা নাড়ল, "না। নীলাম্বর যখন টগবগিয়ে ছোটে তখন কীরকম থ্রিল লাগে। তা ছাড়া জিপ কিংবা কার তো সব জায়গায় পাওয়া যায়, ঘোড়া তো কোথাও পাব না।"
কুমুদিনী ছেলের ডান হাত ধরলেন, "তুই চাইলে যে কোনও জিনিস ঠিক পেয়ে যাবি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, কাউকে দুঃখ দিয়ে কিছু পেতে নেই। সেই পাওয়ায় কোন সুখ থাকে না।"
"নীলাম্বরের পিঠে ঘুরে বেড়ালে বাবা কেন দুঃখ পাবে?"

"তোর বাবা ভয় পান খোকা। নীলাম্বরের পিঠ থেকে পড়ে আমি সারা-জীবন···" কুমুদিনী ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সায়ন। মায়ের সুন্দর মুখটা দু'হাতে ধরে কাঁপা গলায় বলল, "তুমি ভালো হয়ে যাবে মা। বাবা বলেছে আর একটা অপারেশন হলেই তুমি হাঁটাচলা করতে পারবে।"

কুমুদিনী ছেলের দুটো হাত মুঠোয় নিলেন, "কেউ তো আমাকে নীলাম্বরের পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে নি, আমার ভাগ্যটাই এমন ছিল। নালাটা পার হবার জন্যে নীলাম্বর যেই লাফ দিল, অমনি মাথাটা ঘুরে গেল, আর ছিটকে পড়লাম পাথরের ওপর। কেউ ছিল না আশেপাশে। কেউ দ্যাখেনি আমাকে পড়তে। কিন্তু আমি পড়ে যাওয়ার পর ঘোড়াটা বাংলো অবধি দৌড়ে এসে এমন চিৎকার করতে লাগল যে, বুধুয়ারা ছুটে গেল আমায় খুঁজতে। খুঁজে যে তক্ষুণি পেয়েছিল সেটাও আমার ভাগ্য। খোকা, আমি জানি, আর কখনও হাঁটতে পারব না। কিন্তু তাতে আমার একটুও খেদ নেই। তুই হাঁটছিস, দৌড়াচ্ছিস, এতেই তো আমার সুখ। তোর হেঁটে বেড়ানো মানেই আমার হাঁটা চলা।"

এইসময় বকুল বেরিয়ে এলো দুটো প্লেটের মধ্যে একটা গ্লাস চেপে। ওটা গায়ের জোর বাড়ানোর কোনও টনিক, এটা সায়ন জানে। জিনিসটা দেখামাত্র মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। ইদানীং ওষুধ খেতে চান না কুমুদিনী, বলবর্ধক এইসব টনিক তো নয়ই। সায়ন কাছে থাকলে মায়ের আদেশে অর্ধেক গিলতে হয় তাকে। বকুলের সঙ্গে কুমুদিনীর সংলাপ যখন শুরু হয়েছে, তখন সায়ন পা টিপে সরে এলো আড়ালে। বকুল আজ কোনও কথা শুনবে না, মাকে ওটা খাওয়াবেই।

বাড়িটার পেছনে একটা ছোট্ট বাগান আছে। শীত চলে গেছে, কিন্তু ফুলগুলো এখনও ছড়িয়ে আছে গাছে-গাছে। অজস্র মৌমাছি পাক খাচ্ছে বাগানটায়। মৌমাছিগুলো বোধহয় সায়নকে চিনে নিয়েছে এরই মধ্যে। বন্ধুর মতো ব্যবহার করে তারা। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা

মা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে চিরকালের মত পঙ্গু···

সাদা পাথর অনেকটা মোড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে। ওখানে বসলে খুব ভালো লাগে সায়নের। মাথার ঠিক ওপরেই ইউক্যালিপটাস গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরছে দুলে দুলে। সেই পাতার একটা তীব্র গন্ধ এখানকার বাতাসে ভাসে। আর কান পাতলেই অন্তত সাত রকমের পাখির ডাক শোনা যাবে। চেনা ডাকের সঙ্গে অচেনা গলা মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত জগৎ তৈরী করে দেয়।

অথচ তাকে এই জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে মিশনারি স্কুলের হোস্টেলে। সেখানে প্রতিটি ঘণ্টা হিসেব করে ব্যবহার করতে হয়। পড়াশোনা, ঘুমানো, খেলা—সবই ফাদারদের রুটিন মতো করতে হবে। ছুটিতে বাড়িতে আসার পর সায়নের প্রত্যেকবারই মনে হয় যদি তার স্কুল আর না খুলত, সে যদি চিরকাল এখানেই থেকে যেতে পারত, তা হলে তার চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না।

হঠাৎ মৃদু শব্দটা কানে আসতেই সজাগ হয়ে গেল সায়ন। খুব সতর্ক পায়ের আওয়াজ ঠিক তার ডানদিকে। সে ধীরে-ধীরে মুখ ফেরাতেই খরগোশের শরীরটাকে দেখতে পেল। খুবই বাচ্চা খরগোশ ওটা। সাধারণত খরগোশের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় না। এটা বোধহয় এখনও সে-সব কায়দা শেখে নি। খরগোশটাও একমনে সায়নের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর সেই মুহূর্তেই কাণ্ডটা ঘটে গেল। খরগোশটার ঠিক পেছনে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা কুচকুচে কালো সাপ। বেশ মোটা এবং লোভী এবং শব্দহীন। খরগোশটা টেরও পাচ্ছে না যে, তার মৃত্যু অত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময় কয়েকটা কাক এমন কর্কশ গলায় মাথার ওপর ডেকে উঠল যে, খরগোশটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাপ তাকে তুলে নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

এবার চমক ভাঙল সায়নের। সে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, "সাপ, সাপ! তাড়াতাড়ি এসো, সাপ খরগোশ ধরছে।"

চৌকিদার, গুপি ড্রাইভার আর বুধুয়া সর্দার ছুটে এসে যখন সায়নের পাশে

দাঁড়িয়েছে, তখন সাপটার কোনও চিহ্ন নেই। গুপি ড্রাইভার লম্বা লাঠি দিয়ে ঝোপটাকে পিটিয়েও তাদের হদিস না পেয়ে বলল, "ঠিক দেখেছ তো ছোটা সাহেব? এখনও জল নামেনি, সাপের ঘুম ভাঙল কী করে?"
তাই শুনে বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "এ হলো কালসাপ। সব কালে থাকে। এই বাংলোর পাহারাদার। আজ পর্যন্ত এই বাংলোয় কোনও চোর ঢোকেনি ওই সাপের জন্যে। একা নয়, ওর এক স্যাঙাত আছে এই বাংলোয়। ছোটা সাহেবের কপাল ভালো যে, ওর দর্শন পেল।"
তারপর সবাই মিলে নানান প্রশ্ন শুরু করল। কেমন দেখতে, কতটা কালো, ফণা যখন তুলেছিল, তখন মাথায় কিছু আঁকা ছিল কি না। সায়নের এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে খুব ভালো লাগছিল। সে যা দেখেছিল, তার সঙ্গে যা দেখে নি তাও জবাব দেবার সময় মিশে যাচ্ছিল। এবং সেইসব কথা শোনার সময় শ্রোতাদের দারুণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। বুধুয়া-বুড়ো হাতজোড় করে বিড়বিড় শুরু করল। বাচাল গুপি ড্রাইভারও চুপচাপ হয়ে গেল। যেন এইমাত্র ওই কালো সাপটা বাসুকির চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়াবে এই রকম আবহাওয়া তৈরি হচ্ছিল। আর তখনই দোতলার বারান্দা থেকে বকুলের ডাক ভেসে এল, "আরে এই বুধুয়া, মেমসাব ডাকছেন। ছোটা সাহেবকেও আসতে বল।"
পুরো দলটা যেন খানিকটা অনিচ্ছায় এগোতে লাগল। কালসাপ যদি আবার দর্শন দেয় এই আশা ছিল ওদের, এখান থেকে চলে গেলে সেটা হারিয়ে যাবে। কিন্তু মেমসাহেবের ডাক উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সায়ন ততক্ষণে কালসাপ সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জেনে নিয়েছে। এইসব কথা মায়ের সামনে বলতে হবে বলে সে কিছুটা উত্তেজিত।
হুইল চেয়ারে বসে কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "সাপ কে দেখেছে?"
পেছনে পরিচারকদের দল, উদ্ভাসিত মুখে সায়ন জবাব দিল, "আমি।"
"কী রকম সাপ?"
"কালো, মোটা, খুব গম্ভীর।"

"গম্ভীর ? গম্ভীর কী করে বুঝলে ?"

"চুপচাপ খরগোশটাকে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল যে।"

"সাপটা চতুর বলেই তার শয়তানি তোমরা ধরতে পার নি। কিন্তু বাড়ির মধ্যে সাপ ঘুরে বেড়াবে এটা তো ভালো কথা নয়।"

সায়নের শয়তানি শব্দটা একদম পছন্দ হচ্ছিল না। সে বলল, "কালসাপ কখনও শয়তান হয় নাকি ? তুমি জানো না।"

"কালসাপ ?"

"হ্যাঁ। যে-সাপ অনন্তকাল ধরে এই বাড়ি পাহারা দেয়।"

"অনন্তকাল ? মূর্খের মতো কথা বলো না। কোনও প্রাণীই অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না। সাপেরও নির্দিষ্ট আয়ু আছে। তা ছাড়া এই বাড়ি পাহারা দেবার চাকরি ওই সাপকে কেউ দেয় নি। মূর্খ লোকেরাই কল্পনায় বাস করতে ভালোবাসে। সাপ সব সময় সাপই। তার সম্পর্কে গম্ভীর-টম্ভির শব্দ না ব্যবহার করে জঙ্গল ছেঁটে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দাও তোমরা। যাও।"

সায়ন দেখল তার পেছনে দাঁড়ানো কালো মুখগুলো বিমর্ষ, হুকুমটাতে কেউ খুশি হয় নি।

বিকেলের মধ্যে সেদিন বাংলোর সব ঝোপ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুপ্রকাশ ফ্যাক্টরি থেকে কিছু মানুষ পাঠিয়েছিলেন, তারাই কোদাল-কাটারি নিয়ে হাত চালাল। ফুলগাছগুলোকে বাঁচিয়ে সামান্য আড়াল-করা কম দামী গাছদের গোড়া কেটে ফেলা হলো। সায়ন দেখছিল, বুধুয়া-বুড়োর মুখ খুব গম্ভীর। এই কাজটাকে সে মোটেই পছন্দ করছিল না। সায়ন তার শরীরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল. "তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না ?"

"হুঁ", বুধুয়া নিশ্বাস ফেলল, "গাছগুলো ছিল গাছেদের মতো, আমরা আমাদের মতো আর সাপজোড়া আছে তাদের মতো। এটাই তো

ভগবানের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেটাকে গোলমেলে করে দেওয়াটা ঠিক হলো না।”

এই সময় শ্রমিকরা চিৎকার করে জানাল, তারা তিনটে গর্ত আবিষ্কার করেছে। সায়ন দূর থেকে গর্তগুলোকে দেখল। সরল সহজ গর্ত। শ্রমিকদের ধারণা, ওর মধ্যে সাপ আছে, ইঁদুরও থাকতে পারে, একটু বড়টায় খরগোশ বাসা করেছে হয়তো। এই সময় সুপ্রকাশ ফিরলেন ফ্যাক্টরি থেকে। ফিরেই হুকুম দিলেন জলে অ্যাসিড গুলে গর্তে ঢালতে। সায়ন দেখল, বুধুয়া-বুড়ো চলে গেল বাংলোর ভেতরে। এই দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সায়ন দোতলায় উঠে এলো। কুমুদিনী তেমনি চেয়ারে বসে ব্যাপারটা দেখছেন। সায়নের খুব ভয় করছিল। বুধুয়া-বুড়োর কথা-মতো কালসাপ নিশ্চয়ই অনেক ক্ষমতার অধিকারী। ওদের গায়ে কার্বলিক অ্যাসিড পড়লে কী না কী কাণ্ড শুরু করে দিতে পারে। তখন হয়তো এই বাংলোটাকে হাজার চেষ্টা করে বাঁচানো সম্ভব হবে না। কিন্তু এইসব কথা বলার সাহস সায়নের নেই। মা বকে উঠবেন, বাবা বিরক্ত হয়ে তাকাবেন। কিন্তু বুধুয়া-বুড়োর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এখনই প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। আর সেটা ঘটার সময় মায়ের পাশে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গর্ত তিনটের মুখ সামান্য বড় করে একটু একটু করে কার্বলিক অ্যাসিড ঢালা হচ্ছিল। সায়ন দেখল, সুপ্রকাশের নির্দেশে কয়েকটা লোক লাঠি হাতে কাছে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবং তখনই নজরে এলো সুপ্রকাশ-ও হাতে রিভলবার রেখেছেন। বাবার ওটা খুব প্রিয় অস্ত্র।

একটা কালো আগুন যেন ছিটকে উঠল শূন্যে। আর সঙ্গে-সঙ্গে লাঠির আঘাত পড়ল সেটার ওপর। সাপটাকে চিনতে পারল সায়ন। এটাই সেই খরগোশটাকে ধরেছিল। প্রতিবাদ করতেও পারল না বেচারা। তারপরেই আর-একটা একই চেহারার সাপ ফোঁস করে উঠল গর্ত থেকে। কিন্তু সেটাও লাঠির আঘাত এড়াতে পারল না। দুটো বিশাল কালো

সাপ ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে এখন। তিন-তিনটে গর্তের মধ্যে অ্যাসিড পুরে এমন করে আটকে দেওয়া হলো যে, কোনও জীবিত প্রাণী আর ওখানে থাকতে পারবে না।

প্রলয় হলো না, কোনও অস্বাভাবিক ঘটনাও ঘটল না। শুধু শ্রমিকরা মোটকা সাপ দুটোকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। সায়ন বুধুয়া-বুড়োকে খুঁজছিল। কালসাপ দুটো কেন চুপচাপ মরে গেল, বুধুয়া-বুড়ো নিশ্চয়ই একটা কারণ জানাবে। কিন্তু কাছেপিঠে বুধুয়াকে কোথাও দেখতে পেল না সে।

বিকেলের চা খাবার সময় কুমুদিনী তাঁর চাকা-ওয়ালা চেয়ারটাকে চা-টেবিলের গায়ে নিয়ে আসেন। যদিও বকুল সব কিছু এগিয়ে দেয়, কিন্তু দুধ-চিনি গুলে কাপ এগিয়ে দিতে না পারলে কুমুদিনী শান্তি পান না। সায়নের জন্যে বরাদ্দ পানীয় চা নয়, বলবর্ধক একটি পানীয়, যা তার খেতে মোটেই ইচ্ছে করে না। তবু হাতে নিতে হয়, একটু একটু করে গলায় ঢালতে বাধ্য হয় সে। আজ সুপ্রকাশকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। চায়ের কাপ হাতে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। কুমুদিনী সেটা লক্ষ্য করে বললেন, "বাগানটা চমৎকার পরিষ্কার করেছে ওরা। সাপের ভয় আর নেই। সাধারণত জোড়ায় থাকে ওরা, দুটোই মরেছে।"

সুপ্রকাশ মুখ তুললেন, "কে মরেছে?"

সায়নের হাসি পেয়ে গেল। মা যে কথাগুলো বলে যাচ্ছেন, তা বাবার কানে ঢুকছেই না। ছেলের হাসি দেখে কুমুদিনীর বিরক্তি বেড়ে গেল, "এখানে বসে কী যে আকাশপাতাল ভাবছ, ভগবান জানেন। এতক্ষণ যে-সব কথা বললাম শুনতে পাও নি?"

সুপ্রকাশ মাথা নাড়লেন, "সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে সাপ ধরার আয়োজন দেখে বলার সুযোগ পাই নি। আমাদের কয়েকদিন খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "সাবধানে থাকতে হবে কেন?"
সুপ্রকাশ বললেন, "সাপ বাগানে থাকলে তাকে টেনে এনে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু সাপের চরিত্র নিয়ে যে-সব মানুষ চলাফেরা করে, তাদের ধরা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর তাদের সংখ্যাও কম নয়।"
"কী ভণিতা করছ, খুলেই বলো না।" কুমুদিনীর কণ্ঠস্বরে কাঁপন এলো।
সুপ্রকাশ বললেন, "কিছুদিন থেকেই কানে আসছিল এই তল্লাটের হাই-ওয়েতে ডাকাতি হচ্ছে। রাত গভীর হলেই নাকি গাড়ি থামিয়ে লুটপাট করে নিচ্ছে ডাকাতরা। পুলিশ ওদের ধরতে পারছে না। এ-নিয়ে নানা তরফ থেকে ওপর মহলে নালিশ গিয়েছিল, কিন্তু তাতে কাজ হয় নি। একটা পুলিশ-ভ্যান প্রায় একশো কুড়ি মাইল জায়গা পেট্রলিং করে প্রত্যেক রাত্রে। ফলে কোনও একটা স্পটে একবার ভ্যান এসে চলে গেলে ডাকাতরা জানে সেই রাত্রের মতো আর ওটা ওখানে আসছে না। তা এইসব ব্যাপার হাইওয়ের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। ডাকাতি হতো অজানা অচেনা গাড়িতে। কিন্তু হঠাৎ ওরা হাইওয়ে ছেড়ে চা-বাগানে ঢুকেছে। গতরাত্রে নিমবিলা চা-বাগানের ফ্যাক্টরি দখল করে চা লুঠ করে নিয়ে গেছে ওরা। আজ স্বয়ং এস. পি. এসেছিলেন তদন্ত করতে। ডাকাতির পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা সীমান্ত পেরিয়ে ভুটানে ঢুকে গেছে। ওদিকে ভুটান আর নেপাল সীমান্ত, এদিকে ভারতবর্ষ। একবার ওদেশে পা ফেলতে পারলেই ওদের পোয়াবারো। এইরকম সমস্যায় আগে কখনও আমাদের পড়তে হয় নি।"
কুমুদিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের পর এই বাগানে এসে তিনি কোনও সমস্যার সামনে দাঁড়ান নি। স্বামীর কথা শেষ হলে বললেন, "পাহারাদারদের সংখ্যা বাড়াও। পুলিশদের বলো এখানে ঘন-ঘন আসতে।"
সুপ্রকাশ হেসে ফেললেন, "সে-সবই করা হয়েছে। আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলে ভাবছি তোমাদের শহরে পাঠিয়ে দেব।

যদিও বাংলোতে কোনও টাকাপয়সা গয়নাগাটি নেই, তবু তুমি থাকলে লোকে বিশ্বাস করবে না। ফ্যাক্টরিতে যত লোক আছে, তাতে ডাকাতরা সেখানে ঘেঁষতে পারবে না।"

কুমুদিনী বললেন, "না। আমাদের এখান থেকে পাঠিয়ে তুমি একা থাকতে পারো না। যা হবার তা একসঙ্গেই হোক।"

সুপ্রকাশ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি একটা পাগল। ডাকাতরা আদৌ আসবে কি না তার ঠিক নেই, তুমি নার্ভাস হয়ে মরছ। তা ছাড়া ওরা সবে গতরাত্রে একটা বাগানে ডাকাতি করেছে, এখন চট করে কিছু করতে সাহস পাবে না। সায়ন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

ছোট-বড় কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে সায়ন সুপ্রকাশের পিছু-পিছু যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল, সেটার দরজায় চব্বিশ ঘণ্টা তালা দেওয়া থাকে। পকেট থেকে চাবি বের করে সুপ্রকাশ দরজা খুলে আলো জ্বাললেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, "এইটে হলো আমাদের বংশের অস্ত্রাগার। চেয়ে দ্যাখ, সেই প্রাচীনকালের গাদা-বন্দুক, বর্শা, তলোয়ার থেকে আরম্ভ করে ভারী পিস্তল পর্যন্ত এখানে ঝোলানো আছে। এগুলো আমার পূর্ব-পুরুষদের সম্পত্তি।"

এই ঘর সম্পর্কে সায়নের খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু তালাবন্ধ থাকায় কোনওদিন এখানে আসা সম্ভব হয় নি। আজ চোখের সামনে অনেক রকমের প্রাচীন অস্ত্র দেখতে দেখতে সে শিহরিত হলো। সুপ্রকাশ বললেন, "যদিও এইসব অস্ত্রের বেশির ভাগ আজ অকেজো হয়ে রয়েছে, তবু আমার কাছে এর মূল্য অনেক। তোকে দেখালাম, বড় হলে তুই এর যত্ন নিবি।"

সুপ্রকাশ একটা বড় বন্দুক আর কিছু টোটা তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ কর-লেন। ওঁর পকেটে এখনও সেই রিভলভারটা রয়েছে। দু' দুটো অস্ত্র নিয়ে উনি কী করবেন, সায়ন ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্ধে হয়ে গেলেই চারপাশ কেমন ছমছমে হয়ে যায়। বড় বাংলোয় আলো জ্বললেও হাওয়ারা সরাসরি পাহাড় থেকে নেমে এসে এখানেই এমন

আছাড় খায় যে, মনে হয় শব্দে কানে তালা লাগল বলে। খুব কম রাতেই হাওয়ারা শান্ত থাকে আর যে-রাতে সেরকম হয়, সেই রাতে একটা বুনো-গন্ধমাখা নির্জনতা আশেপাশের পাহাড় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে বাংলোটাকে থাবার তলায় ঢেকে রাখে। আজ কিন্তু সেরকম রাত নয়। হাওয়া বইছিল খুব। ধুলোমাখা হাওয়া। রাত্রে ধুলো দেখা যায় না তেমন, এই যা। সায়ন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আগুন দেখতে পেল। পাহাড়ের বুকে আগুন জ্বলছে। চৈত্রমাসে বনবিভাগ থেকে জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হয়। আবার আদিবাসীরাও এই কাণ্ড করে। পাহাড়ের ওপাশটা যেহেতু ভুটানের আওতায়, তাই সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না এদিকের মানুষ। কিন্তু চৈত্রমাসে সন্ধের মুখে পাহাড়ে আগুন জ্বলে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে জ্বলা সেই আগুন দূর থেকে দেখতে মন্দ লাগে না। এই বাংলো থেকে হাঁটাপথে ওই আগুনের জায়গা কম করে চার মাইল হবেই। খুব ডানপিটে মানুষ ছাড়া কেউ যায় না ওদিকে। একটা শুকনো নদী পার হয়ে জঙ্গল ও খাদ ডিঙিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠার আর-একটা বিপদ হলো, বিনা অনুমতিতে বিদেশী রাষ্ট্রে ঢোকার অপরাধে অপরাধী হতে হবে। তাই চার মাইল বলতে দূরত্ব খুব বেশি মনে না হলেও কেউ শখ করে ওখানে যেতে চায় না।

আগুনটা জ্বলছিল বাঁ দিকে। প্রথমে একটা লাল বলের মতো মনে হচ্ছিল। ক্রমশ বলটা লম্বা হতে হতে একটা দাঁড়ি হয়ে গেল। হঠাৎ সায়নের নজরে এলো, ডানদিকে আর-একটা আগুন জ্বলে উঠল। সেটা বল কিংবা দাঁড়ি নয়, অবিকল একটা গুণচিহ্ন হয়ে জ্বলছে। একপাশে দাঁড়ি অন্যপাশে গুণচিহ্ন। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আকস্মিক, আগুন জ্বলতে জ্বলতে ওই চেহারা নিয়েছে, পাহাড়ের গায়ে এরকম কত কাণ্ডই তো ঘটে থাকে। তবে আজ আর কোনওখানে আগুন জ্বলছে না। শুধু ওই দুটো নিপুণ আগুন ছাড়া। নিপুণ, কারণ এত হাওয়াতেও ও দুটো নিভছে না।

"হায় বাপ, হায় বাপ।" ঠিক ঘাড়ের কাছে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠতেই

সায়নের মনে হলো, তার হৃৎপিণ্ড এক লাফে গলায় উঠে এসেছে। কোনও-রকমে মুখ ফিরিয়ে সে বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পেল। বুধুয়া-বুড়ো এক দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ের আগুন দেখছে। সায়নের খুব রাগ হয়ে গেল এইভাবে তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বলে, কিন্তু তার আগেই বুধুয়া-বুড়ো বলল, "ক্ষমা নেই, কোনও ক্ষমা নেই।"

সায়ন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ তুমি ?"

বুধুয়া-বুড়ো সম্মোহিত যেন, তেমনি গলায় বলল, "ক্ষমা নেই।"

সায়ন এবার ভয় পেল। বুধুয়া-বুড়োর গলার স্বরে অদ্ভুত একটা শীতলতা এসেছে, যা তাকে ভয় পাইয়ে দিল। সে দু'পা এগিয়ে বুধুয়া-বুড়োর জামা আঁকড়ে ধরল, "কী বলছ তুমি ? কার ক্ষমা নেই ? কে ক্ষমা করবে ?"

ঝাঁকুনি খেয়ে বুধুয়া-বুড়ো দু'চোখ ঢাকল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "কালসাপ মরেছে, আর নিস্তার নেই। এবার হাওয়াদের নখ গজাবে, বাদুড়ের দাঁত লম্বা হবে। কেন মারল কালসাপ ? হায়-হায়। ওই যে আগুন দেখছ ছোটাসাহেব, ওই আগুনের মানে জানো ?"

"না। কী মানে ?" বুধুয়া-বুড়োর শরীরের সঙ্গে প্রায় সিঁটিয়ে দাঁড়াল সায়ন।

"ক্ষমা নেই, শেষ করে দাও, আঘাত হানো।"

"বুধুয়া-বুড়ো, আমার খুব ভয় করছে।"

"ঠিক আছে। তুমি ঘরে যাও। আমি ওই কালসাপদের গর্তের কাছে গিয়ে ওদের জন্যে প্রার্থনা করে আসি।"

বুধুয়া-বুড়োকে খুব স্নেহপ্রবণ মনে হচ্ছিল। সায়ন আবার জিজ্ঞেস করল, "ওই আগুন কে জ্বেলেছে ?"

"কে জ্বেলেছে ? হায় বাপ! এই বাচ্চাকে আমি কী করে বোঝাই ? আকাশের গায়ে আগুন দিয়ে লেখার ক্ষমতা কার থাকে। বাতাস এসে পাহাড়ে পাক খায়। তার টানে গাছের সঙ্গে গাছের ধাক্কা লাগে। সেই-সময় আগুন বের হয়। সেই আগুনে কালসাপের নিশ্বাস মিশে গেলে

তবেই তো ওই রকম আগুনে-চিহ্ন আঁকা হবে।" কথাগুলো বলতে-বলতে বুধুয়া-বুড়ো নীচে নেমে গেল প্রার্থনার জন্যে।

বারান্দায় দাঁড়াতে পারল না সায়ন। জোরে পা ফেলে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, মা চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছেন। বাবার হাতে টেলি-ফোনের রিসিভার। খুব মগ্ন হয়ে কথাগুলো শুনে সুপ্রকাশ বললেন, "এই তল্লাটের শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের হাতে। গাড়ির অভাব কিংবা ফোর্স নেই বলে আপনি দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। চা-বাগান আর পাহাড়ের মাঝখানে যে হাইওয়েটা, সেটাই না হয় আপনারা পাহারা দিন। আজ রাত্রের মতো এইটে, কাল ভেবেচিন্তে কিছু করা যাবে।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে সুপ্রকাশ বললেন, "পুলিশও হয়েছে তেমন। এখন থেকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে। কী হয়েছে খোকা? তোর মুখ অমন সাদা কেন?"

সায়ন সুপ্রকাশের পাশে এসে দাঁড়াল, "বুধুয়া-বুড়ো বলল, কালসাপ মারা হয়েছে বলে বাদুড়ের দাঁত বড় হবে, হাওয়ার নখ গজাবে।"

"কী যা-তা বকছিস?"

"হ্যাঁ। পাহাড়ের গায়ে লেখা হয়েছে : ক্ষমা নেই, শেষ করে দাও।"

"ও মাই গড!" সুপ্রকাশ চিৎকার করে উঠলেন, "ওই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুড়োটা যা বলল, তাই বিশ্বাস করলি? তুই না ক্লাস সেভেনে পড়িস! কোথায় কী লেখা হয়েছে, চল, আমাকে দেখাবি।"

সায়নের হাত ধরে সুপ্রকাশ বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। সায়ন তন্ন-তন্ন করে পাহাড়টাকে খুঁজেও আর আগুন দেখতে পেল না। সেই দাঁড়ি এবং গুণচিহ্ন মিলিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বুধুয়া-বুড়োর প্রার্থনা কাল সাপরা শুনেছে। কিন্তু সে-কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না সায়ন। সুপ্রকাশ বললেন, "কুসংস্কার মানুষের ক্ষতি করে খোকা। সত্যি কী দেখেছিলি?"

"একটা দাঁড়ি আর একটা গুণচিহ্ন। আগুনের।"

"ভুল দেখেছিস। এইসময় গাছে-গাছে ঘষা লেগে পাহাড়ে আগুন জ্বলে। নতুন কোনও ঘটনা নয়। চিহ্নগুলি তুই তৈরি করেছিস, আর বুধুয়া ওই-রকম ভাবিয়েছে তোকে।"

সুপ্রকাশের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় সায়ন প্রতিবাদ করতে চেয়েও করল না। সে ভুল ছাখে নি, কেউ তাকে ভাবায় নি। মানে যাই হোক না কেন, আগুনগুলোয় অবিকল দাঁড়ি এবং গুণচিহ্ন ছিল।

রাতটা সুন্দর কেটে গেল। কোনও রকম চিৎকার চেঁচামেচি হয় নি, আতঙ্কিত মানুষের কাতর কান্না ওঠে নি, বাংলোর প্রত্যেকটা রাত যেমন কাটে, আজও তেমন কাটল। ঘুম ভাঙা মাত্র সায়ন এক ছুটে বেরিয়ে এলো দোতলার বারান্দায়। সামনের পাহাড়টায় এখনও ছায়া, বেলা না পড়লে রোদ নামে না ওর বুকে। ঘন জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি যায় না। কাল ঠিক কোন্‌খানে আগুন জ্বলেছিল তা এতদূর থেকে ঠাহর করা অসম্ভব।

কাল রাত্রে বুধুয়া-বুড়ো যা বলেছিল সেটা ঠিক হলে এতক্ষণে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত। কুসংস্কার? বাবা ঠিকই বলেছেন বলে মনে হলো ওর। অথচ রাত্রের ওইরকম গা-ছমছমে পরিবেশে কথাগুলো খুব সত্যি বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। তখন যতই যুক্তি দাও, সেটাকে মানতে মন চায় না। আজ সকালে দিনের আলোয় আবার উল্টোটা মনে হচ্ছে। কিছু ঘটলে কী হতো বলা যায় না, তবে এখন বোধ হচ্ছে, সে মিছিমিছি ভয় পেয়েছিল। হাওয়া কি কোনও প্রাণী যে, তার নখ গজাবে? কী হাস্যকর।

এই সময় চাকার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ কানে যেতেই সায়ন মুখ ফেরাল। কুমুদিনী হুইল-চেয়ার ঘুরিয়ে কাছে এলেন, "কাল রাত্রে খুব ভয় পেয়েছিলি, ?"

"হুঁ। বুধুয়া-বুড়ো বলল কালসাপগুলো নাকি ক্ষমা করে না।"

"দূর বোকা! কালসাপ শব্দটার মানে জানিস? বুধুয়াও জানে না। কাল-

সাপ খুব খারাপ অর্থে বলে। যে সাপ বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে হলে কালসাপ। বুধুয়া বলতে চেয়েছে ও দুটো বাস্তুসাপ। যে সাপ দীর্ঘকাল বাড়িতে থাকে, তাকে পোষা জীবের মতো ধরে নিয়ে গ্রামের লোকের বলে বাস্তুসাপ। বুধুয়া তার ওপর অনেক মনগড়া কল্পনা চাপিয়ে তোবে শুনিয়েছে। যা, মুখ ধুয়ে আয়, তোর বাবার ফিরতে দেরি হবে।' কুমুদিনী ওপাশের ঘরে যাওয়ার জন্য চাকায় চাপ দিলেন।

"বাবা কোথায় গিয়েছে?"

"ওমা, তুই জানিস না?"

"না।"

"সত্যি, কী ঘুম তোর! ডাকাত পড়লেও টের পাবি না। ভোর চারটের সময় খবর এলো পাশের বাগানে ডাকাতি হচ্ছে। থানা থেকে খবর আসা মাত্র তোর বাবা সবাইকে জাগিয়ে সাবধান করে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সাহায্য করতে। সেই থেকে কেউ আর ঘুমোয় নি। আধ ঘণ্টা আগে তোর বাবা ফোন করেছিলেন ওখান থেকে। ডাকাতরা সুবিধে করতে পারে নি। পুলিশ এবং অন্যান্য বাগান থেকে সাহায্য পৌঁছে যাওয়ায় ওরা পালাতে বাধ্য হয়েছে। তোর বাবা মিটিং করছেন সবাইকে নিয়ে। শেষ হলেই চলে আসবেন।"

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডাইনিং রুমে এলো সায়ন। সকালবেলার এই খাওয়াটা তাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে খেতে হয়। যত রাজ্যের ভিটামিন আর শরীরে শক্তি বাড়াবার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন কুমুদিনী। যার স্বাদ খুবই খারাপ। অথচ খেতে হয়। কারণ, খাওয়ার সময় বকুল দাঁড়িয়ে থাকে সামনে।

খাবার যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন বকুল বলল, "আজ আমরা সাপের গর্ত খুঁড়ব, আর একটু রোদ উঠলেই।"

সায়ন অবাক হলো, "গর্ত খুঁড়বে কেন?"

"বাঃ, ও দুটো যদি কালসাপ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ওদের গর্তে মণি

লুকনো আছে। এখন গর্ত খুঁড়লেই...” তৃপ্তির হাসি হাসল বকুল। সায়ন দেখল, ওর চোখ-মুখে লোভ চকচক করছে।

‘সাপের মণি পেলে কী হবে?”

“সাপের মাথার মণি সাত রাজার ঐশ্বর্যের চেয়েও দামি।”

“কে নেবে মণিটা?”

“কে নেবে?” হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল বকুল, “তাতে তোমার কী দরকার?”

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল সায়ন, “সাপের মাথায় কোনও কালেই মণি থাকে না। কুসংস্কার থেকেই মানুষ ওসব কথা ভাবে। তোমরা গর্ত খুঁড়লে একটা মরা খরগোশ ছাড়া আর কিছু পাবে না।”

লনে এসে দাঁড়াতেই ওর নজর গেল গর্ত তিনটের দিকে। তারপরেই সে পাহাড়টার দিকে তাকাল। চকিতে একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে পাক খেয়ে গেল। গতকাল রাত্রে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বালিয়ে কেউ সংকেত পাঠায় নি তো? একটা ইংরেজি রহস্য-উপন্যাসে সে এইরকম ঘটনার কথাই পড়েছিল। সেই সংকেতকে বুধুয়া-বুড়ো কুসংস্কারের চোখে দেখেছিল, আর যাদের উদ্দেশে ওই আগুন জ্বালা হয়েছিল, তারা ঠিক মানে বুঝে নিয়ে ভোররাত্রে ডাকাতিতে বেরিয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা যত ভাবছিল, তত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল সায়ন। সেই ইংরেজি উপন্যাসের মতো হুবহু ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে তার মাথায়। কথাটা এক্ষুনি বাবাকে বলা দরকার। আগুনটা যদি সংকেত না হয়, তা হলে ভোরে ডাকাতি হতে যাবে কেন? কিন্তু সায়ন জানে, যাকেই সে এই সন্দেহের কথা বলবে, সে বিশ্বাস করবে না। বাবা বলবে, আজেবাজে বই পড়ে মাথাটা গেছে। এখানকার ডাকাতরা ক্রাইম ফিকশন পড়ে না যে, তোর ধারণামতো কাজ করবে।

অর্জুন লন পেরিয়ে বাংলোর পেছনে চলে আসতেই বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পেল। নীলাম্বরকে দু’হাতে আদর করছে বুধুয়া-বুড়ো। ওর উচ্ছ্বাস ঠিক ছেলেমানুষের মতন। নীলাম্বরটাও বুধুয়ার কাঁধে মুখ ঘষছিল, হঠাৎ সায়নের ওপর নজর পড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। নীলাম্বরের পরিবর্তন লক্ষ্য

করে বুধুয়া-বুড়ো পেছন ফিরে তাকাতেই সায়নকে দেখতে পেল। তারপর খানিকটা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, "ফাঁড়া কেটেছে। কালসাপের রাগ আমাদের বদলে পাশের বাগানে জ্বলেছে। সেখানে ডাকাতি হয়েছে আমরা বাঁচলাম।"

সায়নের মাথায় আর-একটা মতলব খেলে গেল। ওই আগুনের চিহ্নগুলো বুধুয়া-বুড়ো চেনে। কী করে চিনল, সেটা জানতে হবে। সে কাছে এসে বলল, "তুমি প্রার্থনা করলে বলে আমরা বেঁচে গেলাম বুড়ো। তুমি সত্যিকারের ভালোমানুষ।"

বুধুয়া-বুড়ো বলল, "ছোটাসাহেব, মনিবের জন্যে প্রাণ দিতে পারি আমি কিন্তু মনিব যখন বুঝতে চায় না তখন বড় কষ্ট হয়।"

সায়ন আর-একটু কাছে এগিয়ে এলো, "তুমি ওই আগুনের চিহ্ন বুঝতে পেরেছিলে, না?"

"বাঃ, বুঝতে পারব না?" চোখ বন্ধ করে দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়ে কাউকে নমস্কার জানিয়ে নিল বুধুয়া-বুড়ো, "ওগুলো হলো অমঙ্গলের চিহ্ন। আমার বুড়ো বাপ আমাকে শিখিয়েছিল। তাকে শিখিয়েছিল তার বুড়ো বাপ। ওসব হলো শয়তানের পায়ের ছাপ। একমাত্র বোঙ্গার কৃপা না হলে ওই ছাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।"

সায়ন যেন একটা হদিস পাচ্ছিল, "ওই চিহ্নের মানে আর কে কে জানে?"

বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "বেশি লোক আর খবর রাখে না। আজকাল-কার ছেলেরা তো ভগবানেই বিশ্বাস করে না, শয়তান তো অনেক দূর কিন্তু আমার মতো বুড়ো-বুড়িরা ঠিক খবর রাখে। ডাইন যখন কারও অমঙ্গল চায় তখন ওই চিহ্ন আঁকে।"

"এইরকম চিহ্ন কতগুলো তোমার জানা আছে?"

"চার রকম। চার রকমের বেশি নেই তো।"

"আমাকে দেখিয়ে দেবে চিহ্নগুলো?"

"কেন? তোমার কী দরকার?" সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল বুধুয়া-বুড়ো।

"আমি ভগবানে বিশ্বাস করি, শয়তানেও। তাই ওইসব চিহ্ন জানতে চাই। তোমরা যখন পৃথিবীতে থাকবে না, তখন কারও-কারও তো এইসব কথা জেনে রাখা উচিত। তা ছাড়া তোমাকে আমি আর-একটা খবর দিতে পারি।"

চোখ ছোট হয়ে এলো বুধুয়া-বুড়োর, "কী খবর।"

"তোমার কালসাপের গর্ত খুঁড়ে মণি বের করে নিতে চাইছে বকুল।"

কথাটা শোনামাত্র বুধুয়ার মুখচোখ পাল্টে গেল। চোখ থেকে আগুন বের হতে লাগল যেন। তাকে দেখে সায়নেরই ভয় লেগে গেল। সে কোনও রকমে বলল, "রাগ কোরো না বুধুয়া-বুড়ো। বাবা বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত কেউ গর্ত খুঁড়বে না। আমি মাকে বলব যাতে তোমার কথা বকুল শোনে।"

বুধুয়া যেন একটু শান্ত হলো, "ওই গর্ত কেউ খুঁড়বে না। কালসাপের আত্মা আবার ওখানে দেহ নেবে। ওর মণি ওর নিজেরই থাকবে। যদি তোমার মা-বাবা বকুলকে বাধা না দেয়, তা হলে সে মারা যাবে।"

সায়ন বুধুয়া-বুড়োর হাত ধরল, "এ কথাও আমি বকুলকে বলে দেব, যাতে সে তোমার কথা শোনে। তোমার রাগ কমেছে?"

বুধুয়া-বুড়ো এবার নীলাম্বরের পাশে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। তার শরীর থেকে মাত্র এক হাত দূরেই নীলাম্বরের ছটফটে পা। মাথায় সাদা কাশের মতো চুল, কোঁচকানো চামড়ার মুখ দু'হাতে ধরে কিছুক্ষণ বসে রইল বুধুয়া-বুড়ো। তারপর নিরীহ গলায় বলল, "আমি কি আমার জন্যে চিন্তা করি। আমার ছেলেমেয়ে নেই, বউ নেই। পৃথিবীতে আমি একা। তোমাদের এই বাংলোয় আমি তিনকুড়ি বছর কাটিয়ে দিয়েছি। তোমার বাবাকে জন্মাতে দেখেছি। তার বাবাকে দেখেছি, তার বাবাকেও। তোমাদের কেউ ক্ষতি করুক আমি চাই না। যে কবরে পা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার নিজের জন্যে কী দরকার বলো? ছোটাসাহেব, জীবনে কারও ক্ষতি কখনও কোরো না, দেখবে ভগবান তোমার ক্ষতি হতে

দেবে না।"

সায়ন এবার বুধুয়া-বুড়োর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, "তুমি আমাকে চিহ্ন-গুলো দেখালে না?"

বুধুয়া-বুড়ো খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সায়নের মুখের দিকে। তারপর হাত বাড়িয়ে নীলাম্বরের অব্যবহৃত একটা নাল তুলে নিল ডান হাতে। বাঁ হাতে একটা কাঠি নিয়ে মাটির ওপর দাগ কাটল। সায়ন দেখল একপাশে একটা দাঁড়ি, অন্য পাশে দুটো। বুধুয়া-বুড়ো বলল, "এর মানে, একটা বাধা সামনে দাঁড়ালে ডবল হয়ে খতম করো।" ব্যাখ্যা করে ঘোড়ার নালটা ছোঁয়াল বুধুয়া-বুড়ো। তারপর একটা বৃত্ত এঁকে মাঝখানে তিনটে দাঁড়ি আঁকলো। "এইটে হলো: পাপ ঘিরে ধরেছে, এখন পুড়িয়ে মারলেই হলো।" আবার ঘোড়ার নাল ছুঁইয়ে বুধুয়া-বুড়ো বলল, এর মানে হলো, ভগবান আসছে, পালাও।"

সায়ন দেখল, বুধুয়া মাটিতে একটা লম্বা দাঁড়ি এঁকে তার মাথায় যে দাগ কেটেছে, তাতে ইংরেজি টি হয়ে গেল। তারপরেই ঘোড়ার নাল ঘষে চিহ্নটাকে মুছে ফেলতে লাগল বুধুয়া-বুড়ো। এই ব্যাপারটা প্রথম থেকে লক্ষ্য করছিল সায়ন। সব জানা হয়ে গেলে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি নালটা দিয়ে প্রতিবার অমন করছ কেন?"

বুধুয়া-বুড়োর যেন হুঁশ ফিরল। নালটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল সে. "এই সব চিহ্ন বড় অমঙ্গলের। এই বাংলোর জমিতে আমি আঁকলাম তো, কুলগাছের কাঁটা আর ঘোড়ার নালই পারে ওই অমঙ্গলের মাথায় ঝাড়ু মারতে।"

সারাটা দিন কাটল, যেমন অন্যান্য দিন কাটে। সুপ্রকাশ ফিরেছিলেন শান্ত হয়ে। পুলিশসুপার কথা দিয়েছেন হাইওয়ে-ডাকাতদের যেমন করেই হোক রুখবেন। ভুটানের রাজার কাছে চিঠি দেওয়ার জন্যে তিনি ভারত-সরকারকে অনুরোধ করবেন, যাতে অপরাধীরা সেখানে পালিয়ে গেলেও ধরা যায়। এছাড়া এই তল্লাটের সবক'টা চা-বাগানের মালিক এবং

ম্যানেজাররা মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, একটি প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই বাহিনী চা-বাগান এলাকায় অপরাধী ধরতে পুলিশের সঙ্গে হাত মেলাবে। মুশকিল হলো, এই অপরাধীরা কারা, সেটাই ঠাহর করা যাচ্ছে না। সাধারণ শ্রমিক বা স্থানীয় গুণ্ডা-বদমাশ এতটা সাহসী কখনও হতে পারে না। চা-বাগানের ম্যানেজার বা মালিকদের সম্পর্কে তাদের পুরুষানুক্রমে কিছুটা ভীতি আছেই।

খাবার খেয়ে সুপ্রকাশ যখন আবার বাগানে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন, সায়ন তাঁকে সাপের গর্তগুলোর কথা বলল। বকুল চায় গর্ত খুঁড়তে, আর বুধুয়া-বুড়ো তার বিপক্ষে। সুপ্রকাশ বললেন, "গর্ত খুঁড়ে কী হবে ? ওতে তো অ্যাসিড দেওয়া হয়েছে, সাপ আর থাকতেই পারে না।"

সায়ন নিরীহ গলায় বলল, "বকুল বলছে, গর্তের ভেতরে সাপের মণি আছে।"

হাঁ হয়ে গেলেন সুপ্রকাশ, "ইডিয়ট!" তারপর একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি এইসব গপ্পো বিশ্বাস করো ?"

দ্রুত মাথা নাড়ল সায়ন, না। হাসি ফুটল সুপ্রকাশের মুখে, "গুড। অন্ধ কুসংস্কারকে একদম প্রশ্রয় দেবে না। গর্ত খোঁড়ার দরকার নেই। আমি নিষেধ করেছি বলে দিও।"

সুপ্রকাশ গাড়ি নিলেন না। নীলাম্বরের পিঠে চেপে চা-বাগানের কাজ দেখতে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটল সায়ন। বুধুয়া-বুড়ো তখন বাগানের ভেতরে পাথরটার ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল। সায়ন উত্তেজিত গলায় বলল, "বুধুয়া-বুড়ো, তোমার কালসাপের গর্ত কেউ খুঁড়বে না। বাবা নিষেধ করে দিয়েছে।"

বুধুয়া-বুড়ো মাথা নাড়ল, "চারধারে অমঙ্গল চিহ্ন ছোটাসাহেব। কিন্তু তবু ভগবান বড়সাহেবের ভালো করুন। না হলে বকুলের হাত কাটতাম আমি।"

আর একটু বেলা বাড়লে, সূর্যদেব মাথার ওপর থেকে সামান্য ঢললে সায়ন

বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গী হলো। বাংলোর কাজকর্ম করার জন্যে অনেক লোক আছে, বুধুয়া-বুড়োর বয়স হয়েছে বলে কোনও কাজই তাকে ধরাবাঁধা করতে হয় না। কিন্তু সারাদিনে একবার কাটারি আর বস্তা কাঁধে সে বের হবেই। নীলাম্বরকে নিজের হাতে কাটা ঘাস না খাওয়ালে তার স্বস্তি হয় না।

এই সময় কুমুদিনী দিবানিদ্রায় যান। সারাদিন বদ্ধ জায়গায় হুইল-চেয়ারে ঘোরেন মহিলা। কখনও তাঁর খেয়াল হলে ধরাধরি করে নীচের লনে নামানো হয়। দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুপ্রকাশ বেরিয়ে গেলে কুমুদিনী বিছানায় যান। এই সময়টুকু সায়নের ওপর পাহারাদারি করার কেউ থাকে না। এই অসময়ে বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গে সায়ন বেরিয়ে যাচ্ছে বাংলো থেকে, দৃশ্যটা বকুলের চোখে পড়লে কামান দাগত। সাহেবের ছেলে একটা কুলি-বুড়োর সঙ্গে ঘাস কাটতে যাচ্ছে—ছি ছি ছি। কিন্তু সুপ্রকাশের হুকুম শোনার পর বকুলের খুব রাগ হয়েছে। কিচেনে সে বসে আছে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অতএব পাহারা দেবার কেউ নেই।

শিরীষ গাছের ছায়ায় বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গে কিছুটা পথ হাঁটার পর সায়ন পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সবুজ গাছে ছেয়ে আছে সামনেটা। মাঝে-মাঝে যেখানটা ন্যাড়া, সেখানে সাদাটে পাথর রোদে চমকাচ্ছে। সায়ন বুধুয়া-বুড়োকে বলল, "ওই পাহাড়ে যাবে তুমি ? ওখানে নিশ্চয়ই ভালো ঘাস আছে।"

চটজলদি ঘাড় নাড়ল বুধুয়া-বুড়ো, "না, না! ও পাহাড়ে শয়তান আছে। খবরদার, ওইদিকে যাওয়ার মতলব কোরো না।"

"তুমি শয়তানকে নিজের চোখে দেখেছ ?"

"হুম্!" বুধুয়া-বুড়ো সামান্য ছায়া দেখে ঘাস কাটতে বসে গেল।

"দেখেছ ?"

"হুম্।" কাটারি চলছে দ্রুত হাতে। কচাকচ ঘাস টুকরো হচ্ছে

"কেমন দেখতে শয়তান ?" সায়নের চোখ বিস্ফারিত।

"ঠিক শয়তানের মতন। তোমার আমার মতন নয়। তবে হ্যাঁ, কখনও-কখনও বকুলের চেহারায় শয়তান ঢুকে পড়ে।"
সায়ন হেসে ফেলল, "বকুলের ওপর তোমার খুব রাগ, না?"
ফুঁসে উঠল বুধুয়া-বুড়ো, "শয়তান না ঢুকলে গর্ত খোঁড়ার কথা কেউ বলে?"
সায়ন আর-একটা ঠাট্টা করার জন্যে মুখ তুলতেই হতভম্ব হয়ে গেল। দূরে ধুলোর ঝড় তুলে কেউ বা কিছু ছুটে যাচ্ছে। পাহাড়ের দিকে।

পাক খেতে খেতে ধুলোর ঝড় এগিয়ে আসছে। তারপরেই চোখে পড়ল আগে আগে বিদ্যুতের মতো ছুটে আসছে একটা ঘোড়া, আর ঘোড়াটা যে নীলাম্বর তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
সায়ন চিৎকার করে উঠল। নীলাম্বরকে কখনও সে ওই রকম পাগলের মতো ছুটতে দেখে নি। ঘাস কাটছিল বুধুয়া-বুড়ো। চিৎকার শুনে চমকে তাকাল। সায়ন বলল, "বুধুয়া-বুড়ো, নীলাম্বর ছুটে আসছে, একা একা।"
"একা একা? বড়াসাহেব নেই?" বিস্মিত বুধুয়া-বুড়ো উঠে দাঁড়াল, তারপর চোখের ওপর হাতের ছাউনি দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। সুপ্রকাশের প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দেওয়ায় ছ্যাঁত করে উঠল সায়নের বুক। নীলাম্বর বাবাকে পিঠে নিয়ে বেরিয়েছিল চা-বাগানের সরু পথে টহল দেবার জন্যে। নীলাম্বরের একা ফিরে আসা মানে বাবা কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছে নিশ্চয়ই।
"ও নীলাম্বর না, কিছুতেই না।" আচমকা চিৎকার করে উঠল বুধুয়া-বুড়ো।
আবার চমকে উঠল সায়ন। নীলাম্বর নয়? এই তল্লাটে আর কারও ঘোড়া নেই। তা হলে এই ঘোড়াটা কোত্থেকে এলো? সায়ন ততক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। যেটা বুধুয়া-বুড়ো দূর থেকেই বুঝতে পেরেছিল, সেটা এখন তার কাছে ধরা পড়ল। যে ঘোড়াটা আসছে, সেটা নীলাম্বরের

চাইতে খাটো, পিঠে জিন চাপানো নেই, এবং গায়ের রঙ সবুজ। ঘোড়াটা এমনভাবে ছুটে আসছে, যেন মৃত্যু ওকে তাড়া করেছে। পেছনে ধুলোর ঝড় থাকায় ওর ওপরে কেউ আছে কি না, ঠাহর করা যাচ্ছে না। হঠাৎ বুধুয়া-বুড়ো চিৎকার করে উঠল, "এ নিশ্চয়ই শয়তানের ঘোড়া, শয়তানের ঘোড়া, রেতি নদী থেকে উঠে এলো। চোখ বন্ধ করো, চোখ বন্ধ করো ছোটাসাহেব।"

ঘোড়া এবার সামনাসামনি। ছুটতে-ছুটতে ওদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে দিক বদল করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ততক্ষণে ধুলোর ঝড়টা গিলে ফেলল সায়নদের। মুহূর্তেই পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল। সায়ন শুধু শুনতে পেল বুধুয়া-বুড়ো চিৎকার করছে, "ছোটাসাহেব, মুখে হাত দিয়ে বসে পড়ো উবু হয়ে।"

সায়ন বসে পড়ল।

হঠাৎ খিলখিল হাসি কানে আসতে চোখ খুলল সে। বুধুয়া-বুড়ো দুলে দুলে হাসছে। ওকে দেখে তার নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। মাগুরমাছের শরীরে ছাই লাগালে ওইরকম দেখায়। ধুলোয়-ধুলোয় বুধুয়া-বুড়োকে সার্কাসের জোকার বলে মনে হচ্ছে। এবং তখনই তার মনে হলো, বুধুয়া-বুড়ো যখন তাকে দেখে অমন হাসছে তখন সে-ও রক্ষা পায় নি। মাথার চুল, চোখের পাতা বোধহয় সাদাটে হয়ে গেছে। ধুলোর ঝড়টা এখন চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হতেই সে চটপট ঘুরে দেখল, নতুন ঘোড়াটা নেই। ডাইনে বাঁয়ে কোথাও তাকে দেখা গেল না। অথচ সামান্য আগে ওটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। বুধুয়া-বুড়োরও বোধহয় খেয়াল হয়েছে। কারণ সে ফিসফিসিয়ে বলল, "শয়তানের ঘোড়া। নির্ঘাত শয়তানের ঘোড়া। এই দেখা দেয়, এই হাওয়া হয়। মুখ খুললেই আগুন বেরোয়। পালাও ছোটাসাহেব! জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে। এ-ধুলো কিসের ধুলো কে জানে!"

"শয়তানের নিজের ঘোড়া আছে নাকি?" বিরক্ত সায়ন তখন চারদিকে

খুঁজছিল ঘোড়াটার হদিস। তার সন্দেহ হলো রেতি নদীর দিকে একটা গাছের নীচে কিছু নড়ছে। ওটা ঠিক ঘোড়া কি না এত দূর থেকে ঠাহর করা যাচ্ছে না।"

"শয়তানের কী নেই? ভগবানের যা যা আছে, শয়তানেরও তাই আছে। এসব নিয়ে সন্দেহ করারও কোনও কারণ নেই। আর আমাদের ওসব নিয়ে ভাবতে যাওয়ার কী দরকার। ঘোড়াটা নীলাম্বর নয়, ব্যস চুকে গেল। খুব বদ হাওয়া বইছে, এখন ভালোয়-ভালোয় বাংলোয় ফিরে যাওয়াই ঠিক কাজ হবে।" বুধুয়া-বুড়ো তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে কথাগুলো বলছিল।

"তুমি বাংলোয় ফিরে যাও, আমার দেরি হবে।"

"দেরি হবে? দেরি হবে কেন?"

"আমি ওই ঘোড়াটাকে খুঁজব।"

"হায় কপাল। বললাম ওটা শয়তানের ঘোড়া। এই দেখবে সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ সরাবার আগেই উধাও। ওকে কেউ খুঁজতে চায়। চলো।"

সায়নের জেদ চেপে গেল। শয়তানের ভেলকিবাজি বলে কিছু কি থাকতে পারে? বাবা বলেছিলেন, বিজ্ঞানের যুগে এইসব বুজরুকির কথা শোনা-ও অন্যায়। কিন্তু বুধুয়া-বুড়োর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে হেসে ফেলল। এখন সে হাজার বোঝালেও এই মানুষটিকে বোধে ফেরাতে পারবে না। সে বাধ্য ছেলের মতো বুধুয়া-বুড়োর সঙ্গী হলো। বুধুয়া-বুড়ো একটু খুশি হলো। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে সে বলল, "আজ সন্ধে থেকেই বাংলোর চারপাশে আগুন জ্বালাতে হবে। বড়াসাহেবকে রাজি করাতেই হবে। বুঝলে?"

"কেন?"

"শুধু আগুন দেখেই শয়তান ভয় পায়।"

"কিন্তু তুমি বলেছিলে শয়তানেরও নিজের আগুন আছে। তা হলে সে তার ভয় পাবে কেন?"

"সে-আগুন আর এই আগুন এক নয়। সে-আগুনে হাত পোড়ে না, সেটা আগুনের মতন, কিন্তু সত্যিকারের আগুন নয়।" কথাটা শেষ করে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল বুধুয়া-বুড়ো।

ওরা বাংলোর সামনে ফিরে আসতেই দেখতে পেল, বকুল রোদ্দুর মাথায় করে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুধুয়া-বুড়োকে সেই কথা বলা মাত্র তার বৃদ্ধ শরীর যুবকের মতো দ্রুতগামী হলো। গেট খুলে সে ভেতরে ঢুকে যেতেই সায়ন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না বুঝতে পেরে উল্টোদিকে দৌড় শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে চা-বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল। এখান থেকে সে তাদের বাংলোটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ওখান থেকে কেউ তাকে আবিষ্কার করতে পারবে না।

চারপাশে এত ধুলো যে, হাঁটু পর্যন্ত সাদা হয়ে গিয়েছে। সায়ন সেই ধুলোয় দাঁড়িয়ে চারপাশে খুঁজতে লাগল। শেষ যে-জায়গাটায় ঘোড়াটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বলে সন্দেহ হয়েছিল, সেখানে কিছু নেই। সায়ন নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে-যেতে একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। এই যে সে চুপচাপ একটা গাছ কিংবা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, এরকম তো কখনও করে নি। ঘরে এত বিচিত্র আওয়াজও কখনও কানে আসে নি। গাছের পাতা যখন নড়ে, তারও একটা ফিসফিসানি আছে, ফড়িং যখন এ-ডাল থেকে লাফিয়ে ও-ডালে যাচ্ছে, তারও একটা আওয়াজ আছে। এই জগৎটা মানুষের কাছে অজানা থাকে, এতকাল সায়ন নিজেও জানত না। ক্রমশ তার মনে হচ্ছিল, এই চা-গাছের বাগান, শেড্-ট্রির সঙ্গে সে নিজে মিশে গেছে, আলাদা কোনও অস্তিত্ব নেই।

সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে যেতে সে চা-বাগানের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল। এখান থেকেই জঙ্গল শুরু। জঙ্গলটা নেমে গেছে রেতি নদীতে। রেতির ওপার থেকেই ভুটান পাহাড়ের শুরু। সায়ন পিছন ফিরে তাকাল। তাদের এই চা-বাগানটা জনশূন্য, এবং চুপচাপ পড়ে আছে খাঁখাঁ রোদে। এখান থেকে তাদের বাংলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। সায়ন ঘোড়াটার

কোনও হদিস পাচ্ছিল না। একটা জলজ্যান্ত ঘোড়া ধুলোর ঝড় ছুটিয়ে এসে উধাও হয়ে যেতে পারে না।

সায়ন জঙ্গলের মধ্যে পা বাড়াল। মানুষ না করলেও প্রকৃতি অদ্ভুত কায়দায় কিছু পথ তৈরি করে দেয় জঙ্গলের হাঁটা-চলার জন্যে। সায়নের খুব মনে হচ্ছিল, ঘোড়াটা বেশি দূরে যায় নি। কারণ দূরে গেলে দৌড়ে যেত। আর তা হলেই ধুলোর ঝড় উঠত খুরের ধাক্কায়। হাঁটতে-হাঁটতে সে প্রায় রেতি নদীর কাছে যখন পৌঁছে গেছে, তখন জলের শব্দ পেল। কুলকুল শব্দটা একটানা বেজে যাচ্ছে। জঙ্গল সরিয়ে চোখ মেলতেই সে নদীটাকে দেখতে পেল। আশিভাগ শুকনো খটখটে। বোল্ডার আর ছোট পাথর ধুলোময় হয়ে রয়েছে। বর্ষা ছাড়া রেতিতে জলের ঢল নামে না। শুধু এপাশের জঙ্গলের গা ধরে একটা ছোট্ট স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই স্রোতটাই প্রমাণ করছে, নদী এখনও জীবিত। কিন্তু ওখানে মোটেই বেশি জল নেই। জলের নীচের পাথরগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সায়নের খুব ইচ্ছে করছিল, আর-একটু নেমে নদীর ধারে পৌঁছে জলে হাত দেয়। অমন শান্ত স্বরে যে নদী ডেকে যায়, তার শরীর কত না শীতল হবে! সায়ন যে-ই পা বাড়াতে যাবে, ঠিক তখনই চমকে উঠল। মানুষের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ আচমকা কিছু বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে যেন গাছের সঙ্গে মিশে গেল।

কথা বলছে একটা লোক, দুটো গলা তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু সংলাপ হচ্ছে চাপা ভঙ্গিতে এবং তাতে সতর্কতার ছাপ আছে। সায়ন নড়ছিল না। মিনিট দুয়েক পরে সে তিনটে মানুষকে দেখতে পেল। ঠিক আমেরিকান কাউবয়দের মতো পোশাক। দুজনের কোমরে ভোজালি ঝুলছে। একজনের কোমরে রিভলভারের চেয়ে লম্বা একটা আগ্নেয়াস্ত্র। লোক তিনটে খুব লম্বা নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য সুগঠিত। কাউবয়দের সঙ্গে এদের তফাৎ শুধু এক জায়গায়। এদের মাথায় টুপি নেই। পেছনে একটি পুষ্ট টিকি ছাড়া সমস্ত মাথাটা পরিষ্কার করে কামানো। মুখ চোখ দেখে

পরিষ্কার বোঝা যায়, এরা মঙ্গোলিয়ান ঘরানার মানুষ। এবং যে-ভাষায় এই তিনটে মানুষ কথা বলছে, তা সায়নের মোটেই বোধগম্য হলো না। তিনটে মানুষই যেন অনেকক্ষণ ধরে কিছু খুঁজেছে, না পেয়ে এখন কিছুটা ক্লান্ত। তারপর ওরা তিনজন লাফিয়ে-লাফিয়ে রেতি নদীর দিকে নেমে গেল। এবং তখনই সায়নের চোখে পড়ল, নদীর বুকে একটা বিশাল বোল্ডারের গায়ে তিনটে ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া তিনটেই খাটো এবং ছোট সাইজের। মানুষগুলোর সঙ্গে চমৎকার মানানসই। সায়নের চোখের সামনে তিনটে ঘোড়া এবার সওয়ার পিঠে নিয়ে ছুটে গেল নদীর শুকনো বুক ধরে। তারপর ওপাশের জঙ্গলের ভেতর আচমকাই মিলিয়ে গেল।

সায়ন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। এই তিনটে লোক কে? তাদের এই অঞ্চলের কোনও মানুষ ওই রকম পোশাক পরে না, ওই ভাষায় কথাও বলে না। তা ছাড়া সে জানত, একমাত্র তার বাবা ছাড়া আর কেউ ঘোড়া পোষেন না এখানে। কিন্তু খানিক আগে যাকে দেখেছে, তাকে ধরলে আজ চার-চারটে ঘোড়া সে দেখতে পেল। বুধুয়া-বুড়ো সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই লোকগুলোকে শয়তান, এবং ওই তিনটেকে শয়তানের ঘোড়া বলার চেষ্টা করত। কিন্তু সায়নের মনে হলো, ব্যাপারটা এক্ষুনি বাবাকে জানানো দরকার। চেহারা পোশাক এবং ভাষার মধ্যে সামান্য মিল নেই, এমন কিছু রুক্ষ মানুষ ওই পাহাড় থেকে নেমে আসছে, মতলব নিশ্চয়ই কিছু আছে। তাদের স্কুলে কিছুদিন আগে কাউবয়দের নিয়ে একটা ছবি দেখিয়েছিল। কী নির্দয় হয় মানুষগুলো। হাতে দড়ির ল্যাসো নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তেড়ে যায় শিকার-সন্ধানে। সামান্য বাধা পেলে দু'হাতে দুড়ুম দুড়ুম বন্দুক চালায়। তাদের কপালের একভাগ টুপির বারান্দায় ঢাকা থাকে। শেষটা ছাড়া এই লোক তিনটে হুবহু সেইরকম। ভারতবর্ষের মানুষের সঙ্গে কোনও মিল নেই।

সায়ন নদীর ওপারের জঙ্গলটার দিকে তাকাল। শেষ-দুপুরের রোদে মাথা-

মাখি-ভুটানের পাহাড়টাকে খুব শান্ত ও সুন্দর দেখাচ্ছে। তিনটে লোক ঘোড়া ছুটিয়ে ওখানে ঢুকে গেল, অথচ কোনও ধুলোর ঝড় উঠছে না। চা-বাগানের মধ্যে হলে তো এতক্ষণে আকাশ অন্ধকার হয়ে যেত। আর তখনই সায়নের মনে হলো, ওরা যদি তিনজনের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় এসে থাকে, এবং বাকিরা এখন এদিকেই রয়ে যায়, তা হলে তো সে ধরা পড়ে যাবে। আর লোকগুলোর মুখচোখ এবং হাঁটাচলা দেখে ডাকাত ছাড়া অন্যকিছু মাথায় আসছেও না। সায়ন যেখানে ছিল, সেখানেই আরও আধঘণ্টা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। এবং এই সময়ের মধ্যে সে পাখির ডাক এবং গাছগাছালির নিজস্ব শব্দ ছাড়া অন্যকিছু শুনতে পায় নি। শেষ পর্যন্ত তার মনে হতে লাগল, আর কেউ নেই এই তল্লাটে।

সন্তর্পণে সে জঙ্গল সামলে হাঁটতে লাগল চা-বাগানের দিকে। তার বুক টিপটিপ করছিল। বুধুয়া-বুড়োর কথা শুনে বাংলোয় থেকে গেলেই ভালো হতো।

মাথার ওপর ছায়া-ছায়া গাছের ডাল। সামনে সোজা পথ নেই। সায়ন ছটফটে পায়ে এবার এগোচ্ছিল। যত তাড়াতাড়ি পারে, জঙ্গলটা ডিঙিয়ে চা-বাগানে পড়লেই এক-ছুটে বাংলোয় পৌঁছে যাবে সে।

হঠাৎ একটা বাঁক নিতেই খসখস শব্দ কানে এলো। দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ন। কেউ যেন হেঁটে আসছিল। তার পায়ের শব্দ পেয়ে থমকে গেছে। কী করবে বুঝতে পারছিল না সে। উল্টোদিকে ছুটে কোনও লাভ নেই। ওই পথ রেতি নদীতে নেমেছে। আর সামনের পথে সে দাঁড়িয়ে, সে নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব সন্দেহ করেছে।

হঠাৎ একটা শক্তি মনে টেনে আনল সায়ন। সে তো কারও অন্যায় করে নি। কোনও কুমতলবে এখানে আসে নি। কারও ক্ষতি করার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছে তার নেই। সে এসেছিল বেড়াতে। কোনও নতুন জিনিস দেখে নি। এখন বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে পা বাড়াল সায়ন। আর গাছের আড়াল সরে যেতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে সেই ঘোড়াটা।

সমস্ত শরীরে ধুলোমাখা, খাটো কিন্তু শক্তিশালী চেহারা। চোখ দুটো খুব মায়াবী। আর সেই চোখে তাকে দেখছে একদৃষ্টিতে। মাঝে-মাঝে লেজ নেড়ে হয়তো মাছি তাড়াচ্ছে পা থেকে। সায়ন দেখল আর পাঁচটা ঘোড়ার মতো এ জীবন্ত। শয়তানের ঘোড়া ভাবার কোনও কারণ নেই। তার খুব ইচ্ছে করল ঘোড়াটার পিঠে উঠতে। কারণ জিন কিংবা রেকাবি না থাকলেও একটা লাগাম রয়েছে ওর মুখে সাঁটা। সে এক পা এগোতে ঘোড়াটা নড়ল, কিন্তু সরল না। সায়ন ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, যাতে ও তাকে ভালো ছেলে বলে মনে করে। ঘোড়াটার চোখে সন্দেহ, এবং সায়নের মনে হলো, কিছুটা কৌতূহলও উঁকি দিচ্ছে। সে আর-একটু এগোতেই ঘোড়াটা মুখ ফিরিয়ে সামনের পা-দুটো উঁচু করেই নামিয়ে নিল। কিন্তু পালিয়ে গেল না।

মিনিট দশেক লাগল সায়নের ঘোড়াটার পাশে পৌঁছতে। ঘোড়াটা ততক্ষণে কান খাড়া করে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে সতর্ক ভঙ্গিতে। সায়ন ধীরে-ধীরে ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগল। শরীরটা তিরতির করে কাঁপছে। সায়নের মনে হলো, ওদের এতক্ষণে ভাব হয়ে গিয়েছে।

সে লাগামটা ধরল। ন্যাড়া পিঠে রেকাবি ছাড়া সে কোনওদিন ঘোড়ায় চাপে নি। মাঝে-মাঝে সুপ্রকাশ তাকে নীলাম্বরের পিঠে তুলে বাংলোর লনে পাক খাওয়াতেন। সেখানে বসার এবং পা রাখার জায়গা ছিল আরামের। কিন্তু এই ঘোড়াটা তো বেশ বেঁটে। পড়ে গেলে নিশ্চয়ই খুব লাগবে না। সায়ন লোভ সামলাতে পারল না। ঘোড়ার পিঠে চেপে বাংলোয় ফিরে গেলে বুধুয়া-বুড়ো তো বটেই, বাবা-মা পর্যন্ত হতবাক হয়ে যাবেন। সে লাগাম ধরে শরীর ঘষটে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতেই জন্তুটা সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে লাফিয়ে উঠল প্রতিবাদে। কোনও-

রকমে লাগাম আঁকড়ে ধরে পতন সামলাল সায়ন। আর তারপরেই চোখের পলকে কাণ্ডটা ঘটে গেল।
বাংলো নয়, ঠিক উল্টোদিকে রেতি নদী ছাড়িয়ে ভুটানের পাহাড়ের দিকে ছুটতে লাগল ঘোড়াটা, তীরবেগে।

লাগাম দু'হাতে আঁকড়ে ধরেও বসে থাকতে পারছিল না সায়ন। ঘোড়াটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। রেতি নদীর হাঁটুজল কয়েক লাফে ডিঙিয়ে সে নদীর বিশাল পাথুরে চরের ওপর দিয়ে ছুটে এল ভুটানের পাহাড়ি জঙ্গলের দিকে। এর মধ্যে কয়েকবার পড়তে-পড়তে বেঁচে গেছে সায়ন। দুই পায়ে ঘোড়াটার দুটো পাশ আঁকড়ে লাগাম শক্ত করে ধরে উবু হয়ে প্রায় ঝুলে ছিল সে। এই মুহূর্তে শুধু ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পাথরের ওপর পড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া তার মনে অন্য কোনও ভয় কাজ করছিল না।
তিনজন অশ্বারোহী যে-পথে ছুটে গিয়েছে এই ঘোড়াটি কিন্তু সেই পথ ধরে নি। বলা যায় প্রায় উল্টোদিক দিয়েই সে ভুটানের জঙ্গলে ঢুকল। পাহাড়ে ওঠার সময় তার গতি সামান্য কমলেও সায়নের পক্ষে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার পর আর-এক সমস্যা দেখা দিল। বুনো গাছের ডালপালা ভেদ করে ছুটে যাওয়ার সময় সেগুলো যেমন ঘোড়াটার শরীরে আঘাত করছিল, তেমনি সায়নকেও ঘষটে দিচ্ছিল। সায়নের হাত কেটে রক্ত বের হতে লাগল।
ব্যথা বোধহয় মানুষকে কিছুটা ধাতস্থ করে। সায়ন এবার প্রাণপণে চেষ্টা করছিল ঘোড়াটাকে দাঁড় করাতে। অকস্মাৎ যে ঘটনা ঘটেছিল, তার প্রাথমিক ধাক্কা এতক্ষণে যেন সামলে নিল সে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে ঘোড়ার গতি স্থির করতে পারল না। এবং তখনই তার কান্না পেল। ক্রমশ তাদের বাংলো, চা-বাগান থেকে সে দূরে, অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এই ঘোড়া হয়তো শয়তানের নয়, কিন্তু সে একে বিন্দুমাত্র শাসন করতে

সওয়ার বিহীন একটা ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে নিয়ে সায়ন তার পিঠে
সওয়ার হতেই ঘোড়াটা তাকে নিয়ে ভুটান পাহাড়ের দিকে ছোটে···

পারছে না। ভুটানের পাহাড়ে তারা কোনও দিন আসে নি। ক্রমশ দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। এখন এই ঘোড়া তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে! হয়তো সে কোনও কালেই মা, বাবা, বুধুয়া-বুড়োকে দেখতে পাবে না। ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের খাঁচা কাঁপিয়ে কান্না ছিটকে এলো! কিন্তু ঘোড়াটাব তাতে কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। সে যেমন ছুটছিল, তেমনি ছুটে চলল।

হঠাৎ ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। যেন কান খাড়া করে কোনও শব্দ শুনতে চাইল। সায়নের মনে হলো, এই সুযোগ। এখন যদি সে লাফিয়ে নেমে পড়ে, তা হলে কোনও রকমে ফিরে যেতে পারে। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা আওয়াজ কানে এলো। খুব গম্ভীর এবং বেশি দূরে নয়। আওয়াজটা শোনামাত্র ঘোড়া হাঁটা শুরু করল। এবার তার গতি খুব সতর্ক, মেপে-মেপে এবং আওয়াজটা যেদিক থেকে এসেছিল তার বিপরীত দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল ঘোড়াটা। সায়ন বুঝল, ওই আওয়াজটাকে ভয় পেয়েছে ঘোড়া। এবং অমন শব্দ কোনও মানুষ স্বাভাবিক গলায় করতে পারে না। ঘোড়াটা সরতে-সরতে একটা বিশাল শালগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র শব্দটা ছিটকে এলো। কোনোওরকমে ঘোড়ার ঘাড়ের উপর থেকে মুখ তুলে সায়ন ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতেই চমকে উঠল। অত বড় সাপ যে পৃথিবীতে আছে, তা-ই ভাবা যায় না। সাপটার মুখ হাঁ, এবং তাতে প্রমাণ সাইজের একটা হরিণ অর্ধেক ঢুকে আটকে আছে। কারণ, হরিণের শিং সাপের চোয়ালের ভাঁজে বিঁধে যাওয়ায় পুরো শরীরটা পেটের ভেতর ঢুকছে না। আর সেটাকে গেলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সাপটা। অন্তত পনেরো ফুট লম্বা বিশাল শরীরটা স্থির, শুধু মুখ হরিণটাকে নিয়ে ওপরের দিকে উঁচিয়ে, গলার কাছে থরথর কাঁপুনি। এবং গলাধঃকরণে অসুবিধে হচ্ছে বলে সাপটার শরীর থেকে এমন একটা অতৃপ্তি বা আপত্তির নিশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, যা হরিণের শরীরে বাধা পেয়ে বিকট গর্জনের চেহারা নিচ্ছে। সাপের গর্জনের কথা এর আগে

সায়ন শুনেছে। কিন্তু একে কি গর্জন বলে? আক্রোশ ও অতৃপ্তি থেকে ওই শব্দটা জন্ম নিচ্ছে। বিশ্বচরাচরে কোথায় কী হচ্ছে সে-দিকে সাপটার কোনোও হুঁশ নেই। এবং তার পরেই যে দৃশ্যটা সায়ন দেখল, তাতে তার শরীর হিম হয়ে যাবার অবস্থায় চলে এলো। বিশাল ওই সাপের রাগের কারণ এতক্ষণে খুঁজে পেল সায়ন। সাপের মুখের বাইরে হরিণের যে অংশ বেরিয়ে আছে, সেই অংশের আড়াল থেকে সরে এলো একটা চতুষ্পদ জন্তু। ওটা নেকড়ে কিংবা শিয়াল নয়, তার চেয়ে বীভৎস দেখতে। তক্ষুনি নামটা মনে পড়ল সায়নের। হায়েনা। একটা নয়, দুটো। খুবলে-খুবলে ওরা হরিণটার শরীর থেকে মাংস বের করে মজাসে খাচ্ছে। যেন সাপটা কাঁটা-চামচে মাংসের একটা টুকরো ধরে রেখেছে, আর ওরা তা থেকে পছন্দমতো গ্রাস নিচ্ছে। এতে সাপের রাগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে চাইছে দ্রুত হরিণটাকে গিলে ফেলতে। মাংসের ভাগ ফোকটে হায়েনা-গুলো নিচ্ছে, এতেই সে ক্রুদ্ধ। কিন্তু হরিণের বিশাল চেহারা এবং তার চেয়ে বিশাল শিংজোড়া বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হঠাৎ একটা হায়েনা সতর্ক হয়ে উঠল। তার চোখ তীব্র দৃষ্টিতে এদিকের জঙ্গলে সন্দেহজনক কিছু খুঁজল। ঘোড়াটা বুঝতে পেরেছিল, সাপটার কাছ থেকে কোনোও বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু নতুন বিপদ তৈরি হতে যাচ্ছে। সে আর দাঁড়াল না। তীব্র গতিতে জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে চলল সামনে। সঙ্গে-সঙ্গে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠের ওপর শরীর মিশিয়ে শুয়ে পড়ল সায়ন। এর মধ্যে যে-দুটো জন্তু তার চোখে পড়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে ঘোড়ার পিঠটা অনেক বেশি নিরাপদ। এবং হঠাৎই তার খেয়াল হলো সাপটাকে দেখার পর তার সেই কান্নাটা থেমে গেছে।

এই পাহাড় আর জঙ্গলে বিপদ থিকথিক করছে। ওই বিশাল সাপ কিংবা হায়েনা ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও ভীষণ-ভীষণ সব হিংস্র প্রাণী এখানে ঘুরে বেড়ায়। অতএব বাড়ির জন্যে এখন না কেঁদে কোনোও রকমে প্রাণটাকে

বাঁচানোই বুদ্ধিমানের কাজ। আর সেটা করতে গেলে এই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামা চলবে না।

ক্রমশ সন্ধে হয়ে এলো। জঙ্গলে অন্ধকার নামে হুড়মুড়িয়ে। জানান দেবার সঙ্গে-সঙ্গে চতুর্দিক অন্ধকার। কিন্তু আজ সন্ধের আঁধারের সঙ্গে আর একটা আলোর মিশেল দেখা দিল। ফিনফিনে চাঁদ মরা বিকেলে উঁকি মারলে এইরকম আলো আকাশে ছড়ায়। সায়নের অবশ্য আকাশের দিকে তাকাবার অবস্থা ছিল না। ঘোড়ার পিঠের আশ্রয় সে আর ছাড়তে রাজি নয়। বিশ্বচরাচরের কোনোও দিকে তার নজর নেই।

এই ঘোড়ার মুখে যখন লাগাম আঁটা, তখন এটি পোষা জীব। এই পোষা প্রাণীটির সন্ধানেই কি ওই তিন বিকট মানুষ এসেছিল? ওদেরই ভয়ে এই ঘোড়া পেছনে ধুলোর ঝড় তুলে চা-বাগানের মধ্যে ছুটে গিয়েছিল? কেন? এই ঘোড়া কি ওই তিনজনের পোষা প্রাণী নয়?

হঠাৎ ছলাত-ছলাত শব্দ কানে আসতে সায়ন মুখ তুলল। অদ্ভুত এক আঁধার নেমেছে পৃথিবীতে। মাথার ওপর আকাশটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কানে তালা ধরিয়ে ঝিঁঝিরা যে বাজনা বাজাচ্ছিল, তার আওয়াজ বাড়ছে কমছে। ঠিক তাল এবং ছন্দ রেখে। আর তারই মধ্যে ভেসে আসছে জলধারার শব্দ। এতক্ষণে ঘোড়াটাকে স্বাভাবিক এবং নিশ্চিন্ত বলে মনে হলো। সে যেন চিনে-চিনে ঠিক জায়গায় এসে গিয়েছে। টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা যেন পরিস্থিতি জরিপ করছে। সায়ন অনুভব করছিল, তার উপস্থিতিকে ঘোড়াটা যেন পৃথক ভাবে নিচ্ছে না। সে যেন ঘোড়াটার শরীরের অংশ হয়ে গিয়েছে। এবার এক-পা দু'-পা করে ঘোড়া এগোতে লাগল। সায়ন এতক্ষণে মনে-মনে পরিকল্পনা স্থির করে নিয়েছে।

ঘোড়াটা নিশ্চয়ই একটা মানুষের কাছেই ফিরে যাচ্ছে। সে দূর থেকে লক্ষ্য করবে, মানুষটি কেমন। ভালো বুঝলে কাছে গিয়ে সব কথা বলে মিনতি করবে তাকে চা-বাগানে পৌঁছে দেবার জন্যে। আর যদি মনে হয় মানুষটা খুব বদ-টাইপের, তাহলে চুপিচুপি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কোনোও গাছের

ডালে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেবে। কাল সকাল হলে এই পথ ধরে ফিরে যাবে সে চা-বাগানে, একাই। মুশকিল হবে এই, কতটা রাস্তা কীভাবে কোন্ ফাঁক গলে আসা হলো, তার হিসেব মনে নেই। তবু দিনের বেলায় সে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। এর মধ্যে সে ঘোড়াটার কিছু কায়দা-কানুন শিখে ফেলেছে। কাঁধে চাপ দিলে ঘোড়া গতি কমিয়ে দেয়। কাঁধে চাপ ও লাগাম টানা একসঙ্গে হলে সে দাঁড়াবেই। দুই গোড়ালি দিয়ে পেটে লাথি মারলে সে গতি বাড়াবে। এসব শেখা হলো, কিন্তু ঘোড়াটা এমন বেয়াদপ যে, সায়ন ডাইনে-বাঁয়ে লাগাম টানলেও সে মুখ ফেরাচ্ছে না। যে-দিকে যাবার সে-দিকেই যাচ্ছে। তা ছাড়া ঘোড়ার উদোম পিঠে বসা যে কী কষ্টকর, তা এর মধ্যে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিল সায়ন। সমস্ত শরীরে ব্যথা, তাই ঘোড়া নিয়ে নতুন কায়দা শেখার ইচ্ছেটাও হচ্ছিল না।

একটা ঢালু পথে নামতে গিয়েই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। শব্দ হচ্ছে। জলের শব্দের সঙ্গে গাছ ভাঙার শব্দ। মড়মড় করে ডাল ভাঙছে কাছেই। মশারির মতো অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। ঘোড়াটা যখন দাঁড়াল, তখন এ নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। খুব নিঃশব্দে ঘোড়াটা একটা বড় পাথরের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, যাতে চট করে তাকে দেখা না যায়। বলা যায়, পাথরের সঙ্গে মিশেই রইল সে। ফলে সায়নের বাঁ পায়ে ভীষণ চাপ লাগছিল পাথরের। ওর মনে হচ্ছিল এইবার মচ্ করে পা ভেঙে যাবে। কিন্তু এখন চিৎকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ সামনে বিপদ না বুঝলে ঘোড়া এমন করত না। ঠিক সেই সময়ে ডাক শুনতে পেল সে। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে উঠল তার। একেই বোধহয় বৃংহণ বলে। কোনোও রকমে মুখ তুলে সায়ন দেখল পাহাড়ের ওপর সচল পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা একটা করে দশটা চেহারা দেখল সে। কোনোও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেজাজে গাছের ডাল ভাঙছে। হাতি অনেক দেখেছে সায়ন। কিন্তু এমন বিশাল চেহারার হাতি সে কখনও দেখে নি। যেমন লম্বা, তেমন কালো। সুপ্রকাশ তাকে হাতিদের গল্প শোনাতেন। পৃথিবীর এক-

এক অংশে হাতিদের চেহারা এক-এক রকম ্াই অঞ্চলে যে-সব হাতি জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তারা মূলত আসে ওপাশে বার্মা আর এপাশে নেপালের জঙ্গল থেকে। কিন্তু সব পাহাড়ি হাতি তরাইয়ের নিচু অঞ্চলে নামে না। যাদের খিদে মেটে না, জঙ্গলে কিংবা মানুষের চাষ করা ফসলে যাদের রুচি এসেছে, সেইসব হাতি ভুট্টা বা গমের সময় দলে-দলে নেমে আসে পাহাড় ছেড়ে। কিন্তু তাদের চেহারা এত বিরাট নয়। ঘোড়াটা হাতিগুলোকে খুব ভয় পেয়েছে, এটা বোঝা যাচ্ছিল। এবং আর-একটা মজার কাণ্ড, ঝিঁঝির ডাক থেমে গিয়েছে হাতিদের অস্তিত্ব জানাজানি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই। মনে হচ্ছিল, এই জঙ্গলে হাতি ছাড়া আর কোনোও জন্তু বাস করে না। আর কারও কোনোও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঠিক সেইসময় ঘোড়াটার নাক বিকট অথচ চাপা শব্দ করে উঠল। এতক্ষণ যে ছিল ভয়ে সিঁটিয়ে, সে খামোকা অমন শব্দ করতে যাবে কেন? সায়ন মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইল। ঘোড়াটা তখন দু'পা পিছিয়ে এসেছে। আর তখনই সায়নের মনে হলো, তার বাঁ পাটা নেই। অসহ্য যন্ত্রণা হাঁটু আর গোড়ালির মধ্যে পাক খেতে লাগল। ঘোড়াটা পিছু সরতে পাথরের সঙ্গে যে ঘষ্টানি হলো, তাতে সে চোখে সরষে ফুল দেখা সত্ত্বেও একটা শিশু-হাতির অস্তিত্ব টের পেল। হাতিটা খুবই বাচ্চা। লম্বায় এখনও ঘোড়াটার নীচে। টলটলে পায়ে শুঁড় বাড়িয়ে ঘোড়ার মুখে আদরের ছোঁয়া দিতে চাইছে। আর যত সে ওরকম করছে, তত পিছিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা অন্ধের মতন। শিশু-হাতিটা নিশ্চয়ই দল থেকে বেরিয়ে এসেছে কাউকে না জানিয়ে। যেই ওর খবর নেবে ওরা, অমনি ঘোড়া ও মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে যাবে। তখন কী হবে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

সেই অবস্থায় যতটুকু জোরে সম্ভব সায়ন ঘোড়াটার পেটের দুদিকে চাপ দিতেই যেন সম্বিত ফিরে এলো; পলকেই লাফাল ঘোড়াটা, তারপর

ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে ঢালু পথ বেয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করল। এর মধ্যে হাতির দলে সাড়া পড়ে গিয়েছে, দলের মধ্যে কেউ বিপদে পড়েছে ভেবে তারা ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। বাঁ পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সায়ন বুঝতে পারছিল, জঙ্গল ভেঙে কেউ ছুটে আসছে পিছু-পিছু হুড়মুড়িয়ে।

ঠিক তখনই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন জলের শব্দ আরও স্পষ্ট। পেছনের শব্দটা আরও এগিয়ে আসছে। খুব শান্ত ভঙ্গিতে ঘোড়াটা জলে নামল। নদীতে স্রোত খুব, না হলে ঘোড়ার পায়ে জল আঘাত পেয়ে ছিটকে ওপরে উঠত না। ঘোড়াটা খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছিল। ক্রমশ জল বাড়তে লাগল। সায়নের জখম হওয়া পা কনকনে জলে ডুবে গেল। অন্য পায়েরও সেই অবস্থা। স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ঘোড়াটা। পেছনের ছুটে আসা শব্দটা এখন থেমে গেছে। আকাশে হালকা চাঁদ। জলে চকচকে ঢেউ। এই মোলায়েম আলোয় সায়ন দেখল নদীটা বিশাল নয়। এত বড় পাহাড়ের বুকে খুব বিশাল নদী থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু স্রোত খুব। আর ঘোড়াটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে স্রোতকে সঙ্গী করে ওপারে পৌঁছাতে।

হঠাৎ দূরে জলের মধ্যে তোলপাড় শুরু হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল ঘোড়াটা। মরিয়া হয়ে সে ছুটে চলল ওপারের দিকে। সায়নের বাঁ পা এতক্ষণ অবশ ছিল। এখন একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাক খেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছিল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল ওর কাছে। অথচ দূরের তোলপাড়-করা জলের শব্দটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। ঘোড়াটাও বুঝতে পেরেছে বিপদ খুবই কাছে। সায়নের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। মাথার ভেতরটা শূন্য। কোনোও বোধ বা বুদ্ধি তার কাজ করছিল না। শুধু তার দুটো হাতের মুঠো লাগাম ছাড়ছিল না এতক্ষণের অভ্যাসে।

এইসময় ঘোড়াটা প্রচণ্ড চিৎকার করে মরিয়া হয়ে লাফ দিল শূন্যে। নদীর অন্য পার যে কাছে এসে গেছে, তা জেনেছিল ঘোড়াটা। কিন্তু সে

লাফানো মাত্র সায়নের হাতের মুঠো থেকে লাগামটা খসে গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকে তার শরীর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হলো। এবং ক্রমশ চেতনাহীন নেমে এলো লম্বা ঘাসের জঙ্গলে।

সমস্ত শরীরে জ্বলুনি। যেন প্রতিটি রোমকূপে কেউ হুল ফোটাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সায়ন কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা টের পেল চেতনা ফিরে এলে। কাঁধের ব্যথাটা যত, তার চেয়ে ঢের বেশি শরীরের জ্বলুনি। সায়ন ডান হাত তুলে মুখের কাছে এনে টের পেল, তার শরীরটা অজস্র পিঁপড়েজাতীয় কিছুতে ঢেকে ফেলেছে। ঠোঁটের ফাঁকে, এবার তারা নাকের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। সে শুয়ে আছে লম্বা শণজাতীয় ঘাসের জঙ্গলে। একটা ভয় তার শরীরের সর্বত্র এমনভাবে প্রবেশ করল যে, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে টের পেল বাঁ পায়ের গোড়ালিটা নাড়তে পারছে না। সারা শরীরে ঘুরে বেড়ানো লাল পিঁপড়েগুলোকে প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে খেয়াল করল, সে এখানে পড়েছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। নদীর জলে এমন কিছু তেড়ে এসেছিল যে, ঘোড়াটা ভয় পেয়ে প্রচণ্ড লাফ দিয়েছিল পাবে উঠে আসার জন্যে। সেই সময় সে ব্যালান্স হারিয়ে ঘোড়াটার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে। আর এই কারণেই কাঁধে ব্যথা, গোড়ালি মচকেছে।

পিঁপড়েগুলোর হাত থেকে মুক্তি পেতে সময় লাগল। সমস্ত শরীব ফুলে গেছে ওদের কামড়ে। প্রায় সিকি ইঞ্চি মোটা হয়ে গেছে শরীর। সায়নের মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল এক ধরনের মাংসখেকো পিঁপড়ে আছে, ঘণ্টাখানেক অচেতন পেলে যারা একটা হাতিকেও সাবাড় করে দিতে পারে। তারপর যে আসবে, সে শুধু কয়েকটা হাড় এবং দাঁত দেখবে। ভাগ্যিস তার পিঁপড়েগুলো ওই জাতের ছিল না। কারণ সে কতক্ষণ এখানে পড়ে ছিল তা নিজেই জানে না। এখন রাত কত ?

আকাশ ভরা তারা। যেন লক্ষ লক্ষ হিরের নয়ন করুণ দৃষ্টিতে তাকে

দেখছে। সায়নের বুকের ভেতরে নিশ্বাস পাক খেতে লাগল। কী ভাবে সে এখান থেকে ফিরে যাবে! তাদের চা-বাগান থেকে ভুটানের এই জঙ্গলের কতটা ভেতরে সে চলে এসেছে ঘোড়ার পিঠে চেপে, তাও তো ছাই জানা নেই। সে সামনে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে তাকাল। তারার আলোয় জল দেখা যাচ্ছে। তীব্র স্রোত। আর এই নদীতেই এমন কিছু আছে, যাকে ভয় পেয়েছিল ঘোড়াটা। নদী পেরিয়ে গেলেও হাতি কিংবা হায়েনাদের সামনে পড়তেই হবে। এ ছাড়া আর কী আছে কে জানে! এখন তো কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে ঝিঁঝি পোকার দল। এক সঙ্গে এত ঝিঁঝি ডাকছে যে, মনে হচ্ছে কারা করাত চালাচ্ছে। বুকের বন্ধ বাতাসটা ক্রমশ কান্নায় পালটে যাচ্ছিল। বাবা-মায়ের জন্য সায়নের প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। বুধুয়া-বুড়ো নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন সে বীরত্ব দেখিয়ে চুপচাপ আসতে গেল! সায়নের চোখ ফেটে যখন জল বেরিয়ে আসছে, ঠিক তখনই একদম গায়ের কাছে ফোঁস করে শব্দ হতেই সে চমকে লাফিয়ে সরতে গিয়ে আবার গোড়ালিতে যন্ত্রণাটা টের পেল। কিন্তু ততক্ষণে সে ঘোড়াটাকে দেখেছে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ঘোড়াটা ঘন-ঘন নাকে শব্দ করছে। সায়নের খেয়াল হলো, একটু আগেও ঘোড়াটা ওখানে ছিল না। তাকে তাকাতে দেখে ঘোড়াটা কয়েক পা বনের অন্ধকারে এগিয়ে আবার ফিরে এসে তেমনি শব্দ করতে লাগল। প্রাথমিক ভয়, অসহায়তা থেকে মনের কষ্ট, মা-বাবার জন্য দুঃখ, এইসব ছাপিয়ে সায়ন বুঝতে পারল, ঘোড়াটা তাকে কিছু বলতে চাইছে। সেইটে বুঝে সে দু-পা খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই গোড়ালির ব্যথাটা আরও তীব্র হলো। যেন কেউ তার হাড়ে পেরেক ঠুকছে।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে পরিষ্কার পা-মাড়ানো ঘাস নেই। প্রায় কোমর-ছোঁওয়া ঘাসের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে। যদি এখন বর্ষাকাল হতো, তা হলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না। তীব্র গরমে জোঁকেরা উধাও হয়ে যায়। কিন্তু যেই বৃষ্টি নামে, জল জমে, অমনি তারা ফিরে আসে।

আর এই নদীর ধারের গাছগুলো হলো জোঁকের নিশ্চিন্ত আবাস। ঘোড়াটা বুদ্ধিমান। সায়ন যে হাঁটতে পারছে না, এটা বুঝে সে নিজেই এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল।

কোনোওরকমে ডান পায়ের ওপর শরীরের ভর রেখে, দু'হাতে লাগাম আঁকড়ে ধরে সায়ন বাঁ পা'টাকে টেনে কোনোওক্রমে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তার কাঁধে এখন তেমন যন্ত্রণা হচ্ছে না। আর পা'টা ঝুলে থাকায় কিঞ্চিৎ আরাম লাগছে এখন। সায়নের হঠাৎ মনে হলো, ঘোড়াটা বোধহয় চাইছে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সে বুঝতে পারছিল, ওর পিঠে না চেপে সে এই ভয়ঙ্কর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

ঘোড়াটা খুব তড়বড়িয়ে নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিল। বড্ড জোরে শরীর নাচছিল ওর, যেটা সায়নের সহ্য হচ্ছিল না। সে লাগাম টেনে বোঝাতে চাইলে ঘোড়াটা বুঝল। যত ওপরে উঠছে, তত জলের স্রোত শব্দ তুলছে। ঝিঁঝির ডাক, সেইসঙ্গে পাথরে জলের ঘর্ষণের শব্দ অদ্ভুত একটা মায়াবী সঙ্গীতের মতো বাজছিল।

নিশ্চয়ই এখন মধ্যরাত। জঙ্গলের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর সেখান থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে মশার দল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়াটা আবার ছুটতে শুরু করল। যত ব্যথাই লাগুক, সায়ন ঘোড়াটাকে আঁকড়ে রইল, যাতে পড়ে না যায়। এইসব মশা বোধহয় ছুটন্ত প্রাণীকে তাড়া করে না।

কিন্তু ঘোড়া তো ফিরে যাচ্ছে না। ও তো আরও ভেতরের দিকে এগোচ্ছে। সায়ন সেটা বোঝাবার জন্যে লাগাম টেনে ওকে জলের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। নদী পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করতে লাগল বারংবার। এইবার জলের ধারে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা স্থির হলো। ওর শরীরের কোনোও নার্ভও বুঝি কাঁপছে না। এবং তখনই জলের মধ্যে একটা শব্দ এবং কিছুটা জল ওপরে ছিটকে উঠতেই ঘোড়াটা মুখ ফিরিয়ে আবার দৌড় শুরু করল ওপরের দিকে। ওই এক পলকেই সায়ন দেখে নিয়েছে

জলের জন্তুটাকে। কুমিরজাতীয় কিছু মনে হচ্ছিল।
ওই নদী না পার হলে সে কোনোওকালেই বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। আর এই পা নিয়ে আপাতত নদী পার হওয়া অসম্ভব। তারপর ওই জলজ প্রাণীটি নিশ্চয়ই তাকে ছাড়বে না। এরা সংখ্যায় কত আছে, তাই বা কে জানে। যা হবার তাই হোক, ক্রমশ এইরকম একটা ভাব ফিরে আসতেই সায়নের খিদে পেয়ে গেল। সেই কখন সে খেয়েছে, এখন পেটের ভেতরটা গোলাচ্ছে।
সায়নের হঠাৎ খেয়াল হলো তাদের সঙ্গে কেউ দৌড়চ্ছে। একদিকে নদী, অন্যদিকে গভীর কালো পাহাড়ি জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কেউ সমানে দৌড়ে যাচ্ছে তাল রাখতে। ওটা কি কোনও প্রাণী? আর সেই প্রাণীর অস্তিত্ব কি টের পেয়েছে ঘোড়াটা? তাই এত ব্যস্ততা! যদি বাঘ হয়, তা হলে দূরত্ব কমে এলে ছোট একটা লাফ এবং ঘোড়ার পিঠে পড়লে প্রথমে তাকেই তুলে নিয়ে যাবে নিজের খাবার হিসেবে। ব্যাপারটা ভাবতেই শরীরে ঠাণ্ডা জলের স্রোত বয়ে গেল। সে প্রাণপণে চিৎকার করল, "অ্যাই, হ্যাট্ হ্যাট্।" সঙ্গে-সঙ্গে অনুসরণকারীর পদশব্দ থেমে গেল। যেন কোনোও অপরিচিত শব্দ শোনায় সে খুব অবাক হয়ে অনুসরণ করা থেকে বিরত হলো।
এবার ঘোড়াটার গতি কমল। তখনও কোথাও আলোর আভাস নেই। শুধু আকাশের তারা ছাড়া। ধীরে-ধীরে সায়ন খুব অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। খিদের যন্ত্রণায় তার চোখে ক্রমশ ঘুম নেমে আসছিল। সে দু'হাতে লাগামটাকে এমনভাবে ধরে থাকল, যাতে আর পড়ে না যেতে হয়।
এই সময় ঘোড়াটা জলের মধ্যে নামল। সে তন্দ্রার ঘোর থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে দেখল। নদীর জল কিছুটা সমতল এবং কোনোও ঘাস বা আবর্জনা-শূন্য জায়গায় উঠে এসেছে। এখানে জল আধ হাঁটুর বেশি নয়। নদী পাহাড় থেকে নামতে নামতে ডান দিকের একটা জায়গায় নিজের কিছুটা জল তুলে দিয়েছে। ঘোড়ার নালের আকৃতির সেই

জলাশয় পেরিয়ে যেতে ঘোড়াটা কোনোও অস্বস্তিতে ছিল না। যেন সে নিশ্চিন্ত যে, ওই জলজ প্রাণীটা এই নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে উঠে আসতে পারবে না। এখানে জল এত পরিষ্কার যে, নীচের নুড়িগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রাত্রে তাদের রঙ বোঝা যায় না। কিন্তু তারার আলোয় সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। ঘোড়াটা চলছে খুব ধীরে ধীরে, জলের মধ্যে পা ফেলে ফেলে।

ক্রমশ জলাশয়টা শেষ হয়ে এলো। কিন্তু সায়ন দেখল, একটা খাড়ির মধ্যে খানিকটা জল ঢুকে গেছে। যার দু'ধারে জঙ্গল এবং পাহাড়। ঘোড়া সেই খাড়ির দিকে এগোতে লাগল। তার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, চেনা জায়গায় পা ফেলছে। খাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়ার পর নদীটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সামনে, দু'পাশে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে।

জল ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ডাঙায় উঠল ঘোড়াটা। এখানে ঘাস নেই। নরম বালি সরের মতো ছড়িয়ে আছে। জায়গাটার তিন দিকে পাহাড় থাকায় ঘরের মতন মনে হচ্ছে। বেশ বড় হলঘরকেও ছাড়িয়ে যায় অবশ্য। ঘোড়াটা সেখানে পৌঁছে চিৎকার করে ডাকল। এবং প্রচণ্ড শক্তিতে গা-ঝাড়া দিতে লাগল। লাগাম হাতে ধরে থাকা সত্ত্বেও সায়নের শরীরটা কাঁপতে লাগল। মুহূর্তেই পায়ের ব্যথা ও কাঁধের যন্ত্রণা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, সে চোখের সামনে হাজার হাজার হলুদ ফুল দেখতে লাগল। তার শরীরটা ক্রমশ ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝুলে পড়ল এক পাশে। শেষ চেষ্টা করে সে ডান পায়ের ওপর ভর রেখে বালিতে নেমে পড়ল। কিন্তু ডান পায়ে শরীরের ওজন না রাখতে পারায় সে ক্রমশ হাঁটু মুড়ে বালিতে বসল, এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল, "মা গো!"

সে নেমে যাওয়ামাত্র ঘোড়াটা গা-ঝাড়া বন্ধ করল। তারপর পাহাড়ের এককোণে পৌঁছে শান্ত স্বরে ডাকতে লাগল। সায়নের বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। সে ধীরে-ধীরে দুটো পা প্রসারিত করে শুয়ে পড়ল। আর তখনই তার মনে হলো, এর চেয়ে আরাম আজ সারাদিনে কিছুতেই পায় নি।

শরীরের তলায় মিহি নরম শুকনো বালির বিছানা খুব মোটা গদিওয়ালা খাটের চেয়েও বেশি আরামদায়ক। জখম গোড়ালিটাও নরম বালিতে কিঞ্চিৎ ডুবে যাওয়ায় বেশ আরাম হচ্ছে। সে চোখ খুলল। মাথার ওপর নির্মেঘ আকাশ। ঝকঝক করছে নীল শামিয়ানায় হিরের মতো তারারা। সায়ন এক মনে দেখছিল। এই মুহূর্তে তার কোনোও শারীরিক কষ্টবোধ ছিল না। অথবা থাকলেও সেটা শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত একটা অবসাদ ও কষ্ট সায়নের দু'চোখ বেয়ে জল টেনে আনল। চোখের সামনে আকাশ ঢেকে গেল জলে; অস্পষ্ট হয়ে গেল হিরের মতন ওই তারার ভিড়।

আর ঠিক তখনই মনে হলো, কেউ তার শরীরে উঠছে। এক হাতে শরীরের সেই জায়গাটায় ঝটকা মারতেই সেটা ছিটকে পড়ল খানিকটা দূরে। তাড়াতাড়িতে চোখ মুছে সে কোনোও রকমে উঠে বসতেই ব্যথাটা চাগিয়ে উঠল। কিন্তু সেটা ছাপিয়ে উঠল বিস্ময়। ইয়া বড়-বড় কাঁকড়া দাঁড় তুলে এগিয়ে আসছে বিভিন্ন বালির গর্ত থেকে। যে কাঁকড়াটাকে সে ছিটকে ফেলেছিল, সেটা আহত হয়েও হাল ছাড়ে নি। আবার এগিয়ে আসছে তার দিকে। এগুলো কি মানুষখেকো কাঁকড়া? কাঁকড়া তো মানুষের পায়ের শব্দ পেলেই ভয় পেয়ে গর্তে গিয়ে লুকোয়। কিন্তু এরা হিংস্র ভঙ্গিতে তেড়ে আসছে কেন?

প্রাণপণে দু'হাতে বালি ছিটোতে লাগল সে। নরম বালি মুঠোয় নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। সেই তারার আলোমাখা রাতের কাঁকড়াগুলোর দিকে। আকস্মিক আক্রমণে কাঁকড়াগুলো থমকে গেল। বালির ঝাপটা সহ্য করতে না পেরে সরে-সরে যেতে লাগল। আর তখনই ঘোড়াটা ছুটে এলো। সায়নের মনে হচ্ছিল, পাগল হয়ে গিয়েছে জন্তুটা। এলোপাথাড়ি দৌড়চ্ছে তাকে কেন্দ্র করে। পরক্ষণেই দৃশ্যটা দেখে সে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল। ঘোড়াটার পায়ের চাপে কাঁকড়াগুলো সশব্দে ফাটছে। অন্য কাঁকড়াগুলো প্রাণভয়ে দৌড়ে ফিরে যাচ্ছে নিজের-নিজের গর্তে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কয়েকটি মৃত কাঁকড়ার শরীর ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। ঘোড়াটা যখন বুঝল, ঝামেলা চুকেছে, তখন আবার ফিরে গেল পাহাড়ের গায়ে। তারপর অদ্ভুত চাপা গলায় ডাকতে শুরু করল।
সায়ন চোখ তুলে পাহাড় দেখল। একদম ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়। এতক্ষণ বালি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। জেগে থাকা আর ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ধীরে-ধীরে বালির বিছানায় আবার শুয়ে পড়ল। এবং ঘুমের আগে শেষবার চোখ খুলতেই দেখতে পেল, একটা বিশাল কাঁকড়া-বিছে এগিয়ে আসছে একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে। বালির ওপর দিয়ে পায়ের ছাপ ফেলে খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছে সে সায়নের মুখ লক্ষ্য করে। সায়নের চেতনা বিলুপ্ত হবার আগেই মনে হলো এবার উঠে বসা উচিত। আর যা-ই হোক, কাঁকড়া এবং কাঁকড়াবিছে এক নয়। বিশেষ করে এই সাইজের কাঁকড়াবিছে যদি একবার কামড়ায়, তা হলে কোনোও মানুষেব পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অন্তত উঠে বসে বালি ছুঁড়ে ওটাকে ভয় দেখানো যেতে পারে। এক পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে সে। প্রায় এক ফুট লম্বা কাঁকড়াবিছে তার তুলনায় তো কিছু নয়। কিন্তু সায়ন এ-সব কথা শুধু ভেবেই যেতে পারল। প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে নিজের শরীরটাকে সামান্য নাড়াতে পারল মাত্র। কাঁকড়াবিছেটা ধীরে-ধীরে জায়গা কমিয়ে ফেলছে। বালির ওপর মাথা সায়নের। তার চোখ সোজাসুজি বিছেটাকে দেখছে। তেল-চুকচুকে বিছেটাকে কী হিংস্র দেখাচ্ছে। ও যদি সোজা তার চোখের মণি কামড়ে বিষ ঢেলে দেয়? মরিয়া হয়ে আর-একবার চেষ্টা করল উঠে বসতে। কিন্তু তার শরীরটা কিছুতেই উঠল না। কাঁধ পেট পা যেন বালির মধ্যে কেউ পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে।
কাঁকড়াবিছেটা যখন তার চোখের দেড় হাতের মধ্যে এসে গেছে তখন ভয়ে চোখ বন্ধ করল সায়ন। তার চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবু শেষবার, জ্ঞান হারাবার আগে শেষবার সে বিছেটাকে দেখতে যেতেই মনে হলো

একটা বিবর্ণ চামড়ার বুট যেন আকাশ থেকে নেমে এসে কাঁকড়াবিছেটাকে চেপে ধরল বালিতে। বুটসুদ্ধ বিছেটা বালির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে এইটুকু বোধ নিয়ে জ্ঞান হারাল সে।

কর্কশ একটা চিৎকার, সেটা পাখির কিংবা নাম-না-জানা কোনোও প্রাণীর, তা ঠাওর হলো না, কিন্তু সায়নের চেতনা ফিরল। এবং তখনই সমস্ত শরীরে বেদনা ঝাঁপিয়ে এলো। সায়ন চোখ বন্ধ করেই বলল, "মা! ও মা গো।" কিন্তু কোনোও জিনিস বেশিক্ষণ থাকলে শরীর এবং মন তাতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, ইচ্ছে না থাকলেও। এই বেদনাটা যেমন। পা থেকে একটা টনটনানি সমস্ত শরীরে টগবগিয়ে ছুটছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে শুয়ে নেই। তার পিঠের তলায় শতরঞ্জি গোছের কিছু, কিন্তু তার নীচে কোনোও খাট নেই, শক্ত পাথর। এমনকি মাথার নীচে বালিশ পর্যন্ত নেই। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে এলে সে জায়গাটাকে দেখতে পেল। ছায়া-ছায়া, এবং কেমন অদ্ভুত। ঘরের ছাদটা গোল। দেওয়ালগুলো এবড়ো-খেবড়ো। একসময় মনে হচ্ছে, এই বুঝি মাথার ওপর নেমে এলো, চোখ সরাতেই অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। সায়ন ডান হাতটা বাড়িয়ে শতরঞ্জির বাইরে রাখতেই ঠাণ্ডা পাথরের স্পর্শ পেল। এটা তা হলে পাথরের ঘর। তার মানে না আছে নিজের বাড়িতে, না মিশনারি হোস্টেলে।

বোধটা স্পষ্ট হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সায়ন। সঙ্গে-সঙ্গে বেদনাটা আবার পাক খেল পায়ে, পা থেকে হাঁটু ডিঙিয়ে ঊরুতে। কিন্তু সেটাকে আমল না দিয়ে সায়ন হাঁটু ছড়িয়ে বসে ঘরটাকে দেখতে লাগল। এটা কোনোও ঘর নয়। বইয়ে পড়া বর্ণনা যখন হুবহু মিলে যাচ্ছে, তখন এটাকে গুহা বলতে দ্বিধা নেই। মাথার দিকটায় আলো দেখা যাচ্ছে, যা কোনোও বাধা টপকে ঢুকছে গুহার মধ্যে। পায়ের দিকটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিকে তাকালেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁত করে ওঠে। গুহার একটা দেওয়ালে

নানারকম জিনিস ঝোলানো ! ছেঁড়া, তালি-মারা এবং ভালো জামা-প্যান্ট থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নানান জিনিসের সঙ্গে একটা বন্দুক, বড় ভোজালি আর তীর-ধনুক।

এগুলো দেখামাত্র সায়নের খেয়াল হলো এই ঘরে আর কোনোও মানুষ নেই। নিজেকে সংশোধন করল। ঘর নয়, গুহা। কিন্তু কেউ যে এখানে থাকে, তার প্রমাণ ছড়ানো। এবং তখনই তার সেই বুটজোড়ার কথা খেয়াল হলো। বালিতে শুয়ে থাকতে-থাকতে সে যখন অবসন্ন, তখন ওই বুটজোড়া তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সে চোখ তুলে মানুষটাকে দেখতে পায় নি। মৃত্যুটা মরে গেল দেখেই তার চেতনা লোপ পেয়েছিল। সেই লোকটাই কি তাকে এখানে নিয়ে এসেছে? জায়গাটা কোথায়? এই সময় বেশ ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগতে আরাম হলো সায়নের। বাতাস ঢুকছে আলোর পথ দিয়ে। চোখের সামনে একটার পর একটা দৃশ্য দ্রুত পার হয়ে গেল। নদী কিংবা ঝরনা যা-ই হোক, পার হতে গিয়ে ঘোড়াটা বিতিকিচ্ছিরিভাবে লাফিয়ে ওঠায় সে ছিটকে পড়েছিল। না পড়লে পায়ের ব্যথাটা হতো না। তারপর ওই ঘোড়াটাই তাকে নিয়ে এসেছিল বালির টুকরো চরে। এসে চিৎকার করছিল কারও উদ্দেশে। যেন তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে ওইভাবে ডাকতে হবে। ঘোড়াটা নিশ্চয়ই বুটজোড়াকে ডাকছিল।

বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব এবং অবসন্ন সায়ন একই ভঙ্গিতে বসে রইল। এর মধ্যে তার কান্না পেয়েছিল কয়েক বার, কিন্তু শেষমুহূর্তে সে সামলে নিচ্ছিল। এটুকু সে বুঝতে পেরেছিল, কান্নাকাটি করে কোনোও লাভ নেই। তা ছাড়া যে তাকে মৃত্যুর কামড় থেকে বাঁচিয়ে এই গুহায় এনেছে, সে নিশ্চয়ই কোনোও ক্ষতি করবে না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওর মনে পড়ে গেল সেই গল্পটার কথা। এক ধরনের কাপালিক আছে, যারা মানুষদের যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখে নির্দিষ্ট পূজায় বলি দেবে বলে। সে মাথা নাড়ল। আজ অবধি কোনোও বইতে লেখা নেই যে, কাপালিকরা বুটজুতো পরে।

তা ছাড়া এই দেওয়ালের জামাকাপড় এবং আসবাব দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটা মোটেই কাপালিক নয়।

নিশ্চিন্ত হওয়ামাত্র চনমনে খিদেটা ফিরে এলো। সেই দুপুরের পর আর খাওয়া হয় নি। এখন কোন্ সময়? রাত নয় নিশ্চয়ই, তা হলে আলো ঢুকত না। অথচ সে এসেছিল রাতের বেলায়। তার মানে দীর্ঘসময় সে এখানে ঘুমিয়ে ছিল! এখন কিছু খেতে না পেলে মরে যাবে। সায়ন নিজের পায়ের দিকে তাকাতে চমকে উঠল। হাঁটুর কাছটা বেজায় ফুলেছে। কিন্তু সেই ফোলা জায়গায় গাছের পাতা ছেঁচে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাতার রস শুকিয়ে আছে পায়ের চামড়ায়। কেমন নীল এবং কালোয় মেশা পাতা। কে বাঁধল? বুঝতে পেরে সে কৃতজ্ঞ হলো। যাক, লোকটা ভালো। কিন্তু ভালো লোক হলে তাকে খেতে দেবে না কেন?

দুই হাতে ভর দিয়ে সে শরীরটাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেল। গুহার মুখটা সোজাসুজি নয়। সামান্য বাঁকানো বলেই আলো চট করে ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তা ছাড়া আর একটা আড়াল আছে দরজার মতো। সেটা বেশ চওড়া একটা কাঠের পাল্লা। সায়ন ভাবল দেওয়াল ধরে এক পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে কি না! এবং তখনই সে এমন আঁতকে উঠল যে, মনে হলো, হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল এক লহমার জন্যে। প্রায় নিঃশব্দে ঝুপ করে সামনে এসে দাঁড়াল বিশাল সাইজের একটা হনুমান। সে যে ভয় পেয়েছে, আঁতকে উঠেছে, তা প্রাণীটা স্পষ্ট বুঝতে পেরে দাঁত বের করল। তখনও শরীরের কাঁপুনি থামে নি, কিন্তু সায়নের বুঝতে অসুবিধে হলো না, হনুমানটা হাসছে। তাকে ভয় পেতে দেখে বেশ মজা পেয়ে গেছে। তারপর শূন্যে হাত ঘুরিয়ে চট করে শরীরটা বেঁকিয়ে দুই লাফে হাওয়া হয়ে গেল গুহা থেকে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সায়ন আবার শরীরটাকে টেনে চলল দরজার দিকে। আর তখনই চওড়া কাঠের পাল্লাটা সরে গেল সামনে থেকে। তীব্র সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সায়নের। সে কয়েকবার চোখ খোলা-বন্ধ করে সামনে

সায়ন আহত শরীরটাকে টেনে গুহার মুখের দিকে এগোতে গিয়ে
দেখল একটা মানুষ গুহার সামনে আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে…

নেওয়ার আগেই একটি মানুষ সামনে দাঁড়াল আলো আড়াল করে। আলো পেছনে থাকায় লোকটার মুখ ভালো করে দেখতে পেল না সে প্রথমটায়। গুহায় ঢুকে পাল্লাটাকে আবার আধ-ভেজিয়ে লোকটা একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। এখন আলোর তীব্রতা নেই, চোখও সইয়ে নিয়েছে, 'সায়ন লোকটাকে দেখতে পেল। মুখে লাল-সাদায় মেশানো দাড়ির জঙ্গল, কোনোওকালে সেখানে কাঁচি দেওয়া হয় নি। মাথার চুল বেশ ঝাঁকড়া, সেগুলোও আর কালো নেই। পরনের খাকি প্যান্টের ওপর বিবর্ণ জ্যাকেট। লোকটা পকেট থেকে একটা বাঁশের পাইপ বের করে তাতে তামাক পুরতে পুরতে তাকে দেখছিল। তারপর বেশ মৌজ করে সেটাকে ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ছ'পা ছড়িয়ে হাসল। এই সময় হনুমানটা গুহায় ঢুকল শব্দ করে। ছোট চোখে সায়নকে দেখে সে লোকটার একটা পা জড়িয়ে ধরে মুখ ওপরে তুলতেই লোকটা একমুখ ধোঁয়া হনুমানটার দিকে ছাড়ল। সায়ন অবাক হয়ে দেখল, সেই ধোঁয়া শব্দ করে নাক-মুখে টানতে চাইল প্রাণীটা। বেশ মজা পেয়ে লোকটা আলতো আদুরে চড় মারল ওর মাথায়। ধোঁয়া নিয়ে হনুমানটা যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল দুই লাফে।

আর তখনই সায়নের মুখ থেকে প্রশ্নটা ছিটকে এল, "আপনি কে?"

লোকটা হনুমানের চলে যাওয়া দেখছিল কৌতুকে, এবার প্রশ্ন শুনে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। তারপর অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল, "অনেকদিন পর বাংলা শুনলাম। কি নাম তোমার?"

"সায়ন্তন।"

"বাঃ, চমৎকার নাম। সায়ন্তন। মানে কী?"

"সন্ধের সময়। দিন এবং রাতের মাঝখানে।"

"আমাদের সময় এত ভালো ভালো নাম রাখার রেওয়াজ ছিল না। যাক্, তোমার পায়ের ব্যথাটা কেমন আছে?" লোকটা ঝুঁকল, "হুঁ, ফোলাটা একটু কমেছে। হাড় না ভাঙলে ছ'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

আর ভাঙলে কপালে ভোগান্তি আছে সায়নবাবু।" লোকটা এবার উঠে দাঁড়াল।

"আপনি বাঙালি?"

"আপত্তি আছে?"

"না, মানে..."

"অনেকদিন কোনোও কিছু না ব্যবহার করলে তাতে জং ধরে যায়, আমার জিভেও ধরেছে। কিছুক্ষণ কথা বললে ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কি খিদে পেয়েছে? লোকটি জিজ্ঞেস করল।

সায়ন ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল। লোকটি এবার গুহার ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানটায় ছমছমে অন্ধকার। কিন্তু তাতে কোনোও অসুবিধে হলো না ওর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা বড় বাটি হাতে নিয়ে ফিরল সে। সায়নের সামনে সেটাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে শহুরে খাবার পাওয়া যায় না! কিন্তু এখানে যা পাওয়া যায়, শহরের দামি দোকানে অনেক পয়সায় সেটা কিনতে হয়। তোমার কষ্ট হলেও এটা খেতে হবে।"

সায়নের নজর তখন বাটিটার ওপর পড়েছে। লালচে মাংসের তাল, যাতে সামান্য তেলের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল, "কী এটা?"

"হরিণের রোস্ট। সেই আদিম মানুষরা যে-পদ্ধতিতে করত, সেই মতন করে একটু আধুনিক করে নিয়েছি। বাটির একদিকে লবণ আছে। ওইটের খুব অভাব এখানে। খেতে খারাপ লাগবে না। চেষ্টা করো।" পাইপ টানতে-টানতে লোকটা আবার পাথরের ওপর বসল।

চা-বাগানে বাস করেও হরিণের রোস্ট কখনও খাওয়া হয় নি। একবার হরিণের মাংস এসেছিল বাড়িতে। কিন্তু সেটাকে মুরগির মাংসের মতো করে ঝোল রেঁধেছিল বকুল। একটু ছিবড়ে-ছিবড়ে লেগেছিল, তা ছাড়া আলাদা মনে হয় নি কিছু। খাওয়ার টেবিলে বসে সুপ্রকাশ ঠাট্টা করে-

ছিলেন কুমুদিনীকে শুনিয়ে, "এ-বাড়ির সব রান্নার স্বাদ দেখছি একই রকম হয়ে যাচ্ছে। তা বেশ।"

সায়ন মাংসে হাত দিল। এটা যে ঝলসে সেদ্ধ করা হয়েছে, তা আঁচ করতে পারল সে। কারণ আদিম মানুষরা তো তাই করত। কিন্তু হাত দিয়ে বুঝতে পারল, মাংস বেশ নরম। টানতেই আঙুলের ডগায় অনেকটা উঠে এলো। গালে পুরতেই মুখের রসে সেটা সিক্ত হয়ে গেল। একটা ধোঁয়াটে গন্ধ ছাড়া বিদঘুটে কিছু নেই। সামান্য নুন মাখিয়ে নিলে ভালো হতো। সে বাটির পাশে লালচে যে পদার্থটাকে দেখল, তাকে যে নুন বলে, তা স্বাদে টের পেল। এভাবে পুড়িয়ে-সেদ্ধ মাংস সে কোনোওকালে খায় নি। হয় ভাত নয় রুটি সঙ্গে না থাকলে কিছুতেই যে পেট ভরে খাওয়া হয় তা জ্ঞানে ছিল না। পেট ভরতি হয়ে যাওয়ার পর এক ধরনের তৃপ্তি এলো। কিন্তু অস্বস্তিটা থেকেই গেল। এ যেন আলাদা দিন এবং আলাদা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো। ঠিক নিজের নয়।

এই সময় বাইরে খুব চিৎকার উঠল। লোকটি এতক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে খাওয়া দেখছিল। চিৎকার শোনামাত্র দ্রুত বাইরে বেরিয়ে গেল। চিৎকারটা কোনোও মানুষের গলার নয়। খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। যে চিৎকার করছে, সে এখনও থামে নি। সায়নের খুব কৌতূহল হলো ব্যাপারটা দেখবার। সে বাটিটাকে সরিয়ে দিয়ে ঘেঁষটে-ঘেঁষটে দেওয়ালের কাছে পৌঁছে সেটাকে ধরে এক পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আঘাত পাওয়া পা শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে সে এক্কা-দোক্কা খেলার মতো গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। তারপর খোলা মুখটা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখতে পেল। চিৎকার করছে হনুমানটা।

তার দুই হাতের মুঠোয় একটা বিশাল সাপের লেজ। সরীসৃপটা লম্বায় অন্তত চার হাত হবে। আক্রান্ত হওয়ার পর সে শরীর গুটিয়ে হনুমানটাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। কিন্তু যেই সে কাছে আসছে, অমনি হনুমানটা লেজ মুঠোয় নিয়ে তিড়িং করে উলটোদিকে চলে যাচ্ছে। হয়তো লেজের

ডগায় তেমন শক্তি নেই, সাপটা খুব অসহায় হয়ে বারে-বারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেকে মুক্ত করার। কিন্তু কখনই লেজটাকে কাছে টেনে হনুমানটাকে ধরতে চাইছে না। হয়তো আক্রান্ত হয়ে তার এই বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে গেছে। হনুমানটাও বুঝতে পেরেছে লেজ ছেড়ে দিলে সে বিপন্ন হবে। তাই যথাসম্ভব শক্তিতে ওটা আঁকড়ে ধরে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইছে। সায়ন দেখল লোকটা দুই কোমরে হাত দিয়ে বুদ্ধি বনাম শক্তির লড়াই দেখল কিছুক্ষণ। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল।

লড়াই হচ্ছে পাথরের ওপর। এটা একটা পাহাড়। মাটি থেকে জায়গাটা অনেক উঁচুতে। পাথরটা বিশাল এবং সমান। শেষ পর্যন্ত সাপটা একটা খাঁজে মুখ ঢুকিয়ে শরীরটাকে টানতে লাগল। সেই শক্তির কাছে হেরে যাচ্ছিল হনুমানটা। সায়ন দেখল এই সময় লোকটি এগিয়ে গেল। ওর হাত কোমরে ঝোলানো ভোজালির বাঁটে চলে গেল। ওটা যে এতক্ষণ ওখানে ছিল, তা লক্ষ্য করে নি সায়ন। এবার একবার রোদ্দুরে ঝলসে ভোজালিটা আঘাত হানল সাপটার পিঠের ওপরে। তিনবারে শরীরটা বিচ্ছিন্ন হতে লোকটি সাপের মাথার দিকের দেহটা পাহাড়ের খাঁজ থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল নীচে। দেহের বাকি অংশটা তখনও হনুমানের হাতে ছিল। লোকটিকে ছুঁড়তে দেখে সে-ও অনুকরণ করল। কিন্তু সাপটার খণ্ডিত শরীর বেশি দূর গেল না। লোকটি এগিয়ে গিয়ে সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে হনুমানটাকে কোলে তুলে নিল। সায়ন দেখল হনুমানটা লোকটার বুকে গলায় মুখ ঘষছে আর লোকটি বিড়বিড় করে কিছু বলে যাচ্ছে। অনেকটা শিশুরা অভিমান করলে যেমন করে তাদের ভোলাবার জন্যে আদর করা হয়, দৃশ্যটা সেইরকম।

খানিকক্ষণ পরে লোকটি পিছন ফিরতেই সায়নকে দেখতে পেল। একটু হেসে বলল, "এই আমার বন্ধু। ও যদি সাপটাকে না দেখত, তা হলে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।"

"এখানে খুব সাপ আছে বুঝি?"

"খুব নয়, তবে আছে। পাহাড়ের জঙ্গলে না থাকাটাই অস্বাভাবিক।" তারপর খেয়াল হতে প্রশ্ন করল, "অসুস্থ অবস্থায় বাইরে এলে কেন তুমি? যাও, ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও।"

সায়ন মাথা নাড়ল, "আমার আর শুয়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগছে না। আমি যদি একটু বাইরে বসি, আপনার আপত্তি আছে?"

"বাইরে বসবে? বেশ। তবে ওপাশটায় যেও না। এদিকে থাকলে কোনোও ক্ষতি নেই।" নিষিদ্ধ দিকটা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল লোকটি।

আলোকিত চত্বরটায় হেলান দিয়ে বসল সায়ন। সে বুঝতে পারল, বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপর এই গুহাটা। গুহার সামনে পাথরেব চাতালে সে বসে আছে। নীচে, বেশ নীচে, জঙ্গলের মাথা দেখা যাচ্ছে। সেখানে কেমন কুয়াশার মতো আবছা কিছু ভাসছে। দূরে, যত দূরে নজর যায়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল।

এই গুহা থেকে নীচে নামবার কোনোও পথ নেই। যেন মাটি থেকে খাড়াই উঠে আসা পাহাড়ের চুড়োয় এই আশ্রয়। উঁচু বলেই হু হু করে বয়ে আসা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে গায়ে। জায়গাটা যত সুন্দরই হোক না কেন, খুব মন খারাপ হয়ে গেল সায়নের। তার মনে হচ্ছিল আর কখনও সুপ্রকাশ কিংবা কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা হবে না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল, এমন সময় সামনে কিছু এসে দাঁড়াতেই চোখ মেলে হনুমানটাকে দেখতে পেল। হনুমানটার হাতে বাঁশের লম্বা পাত্র। সে তাকানোমাত্র এগিয়ে দিল তার দিকে। সায়ন পাত্রটা নিয়ে দেখল তাতে অনেকটা জল রয়েছে।

এই সময় লোকটি বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। বলল, "জলটা খেয়ে নাও। খাবার খাওয়ার পর জল খেতে হয়। আমি আর ইন্দ্র একটু বেরুচ্ছি। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারো। বেশি নড়াচড়া করলে ফোলা সারবে না। আর এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে না। তা হলে আর বেঁচে থাকার সৌভাগ্য হবে না। আমরা মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে আছি।"

সায়ন জিজ্ঞাসা করল, "ইন্দ্র কে?"
"দেবরাজ। এই হনুমানটাকে আমি ইন্দ্র বলে ডাকি। আমাদের ফলের স্টক শেষ হয়ে গেছে।"
"আপনারা কী করে নামবেন?"
"রাস্তা আছে। সেরে ওঠো, তারপর দেখাব।"
"সাপ-টাপ যদি আসে? জঙ্গলে তো জন্তুও আছে।" হঠাৎ একা থাকতে ভয় করল সায়নের।
"ওসবের মোকাবিলা করা যায়। তবে বুদ্ধি না থাকলে শয়তানের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা অসম্ভব।"
"শয়তান? শয়তান মানে?"
"এখানে মাঝে-মাঝেই শয়তান দেখা যাবে। তবে তাদের চোখ তোমার ওপর পড়ুক, এটা আমি চাই না। পরে কথা হবে। আয় ইন্দ্র।"
সায়নের চোখের সামনে দিয়ে লোকটা গুহার উলটোদিকে চলে গেল। আর ডাক শোনামাত্র হনুমানটা লাফ দিল প্রভুর দিকে। সায়ন মাথামুণ্ডু ধরতে পারছিল না।
শয়তান কি কোনোও জীবের নাম?

মাথার ওপর একটা বাজপাখি উড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সায়ন নীচের দিকে তাকাল। খাড়া এক পাহাড়ের ওপর এই গুহা। চট করে কোনোও মানুষ ভাবতেই পারবে না এখানে কেউ থাকে। আর জানতে পারলেও কারও পক্ষে এখানে উঠে আসা সম্ভব নয়। কারণ এখান থেকে শুধু গাছের মাথাগুলোই দেখা যাচ্ছে। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকায় সেদিকে তাকালে সবুজ মাঠের কথা মনে হয়।
সায়নের পায়ে এখন যদিও যন্ত্রণা হচ্ছে না, কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিল না। যদি পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কী হবে? কথাটা ভাবতে গিয়েই সে হেসে ফেলল। ভবিষ্যতের কথা সব সময়

ভাবলে হয়তো সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু কি নিয়মে চলে? তার কি এই আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের মাথায় খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল? অতএব যা হবার তা হবে। এই পা নিয়ে সে মোটেই ভাববে না।

এই সময় সে হুপ-হুপ শব্দ শুনতে পেয়েই চেয়ে দেখল, ইন্দ্র একটা দড়ির সিঁড়িগোছের কিছু একটা গাছের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়ে ওর দিকে সামান্য ভেংচে নেমে গেল ডাল ধরে। গাছটা বেশ নীচে। দড়িটা নেমে গেছে পাহাড়ের ওপর গুহার পাশ দিয়ে। অর্থাৎ এই দড়ি বেয়ে লোকটা নীচে নামে। এবং নামার পর ইন্দ্র সেটাকে ওপরের গাছে তুলে দিয়ে আসে, যাতে আর কেউ সেটাকে ব্যবহার না করতে পারে। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ মজা আছে। সায়নের মনে পড়ল টারজানের কথা। টারজান তো এই রকম পাহাড়জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বনমানুষ সঙ্গে নিয়ে। তফাত শুধু এই যে, লোকটার বয়স হয়েছে এবং সে ফুলপ্যান্ট ও জুতো পরে।

হাওয়ার তেজ বাড়ছিল। সায়ন আর সোজা হয়ে গুহার দেওয়াল ধরে দাঁড়াতে পারছিল না। তার ভয় হলো, আর একটু জোরে হাওয়া বইলে তাকে ছিটকে ফেলবে এখান থেকে। সে ধীরে-ধীরে সরে এলো। লোকটা চলে গেল, ওর সঞ্চয়ের ফলমূল শেষ হয়ে গেছে, তাই নিয়ে আসা দরকার। যেন থলে নিয়ে বাজার করতে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এখানে কোনোও বাজার নেই, মানুষই বোধহয় থাকে না। এই জঙ্গলের মধ্যে দোকান থাকা অসম্ভব। এখানকার গাছে কি খাবার মতো ফল পাওয়া যায়? আর সেই ফল এবং হরিণের পোড়া মাংস খেয়ে লোকটা বেঁচে আছে? নিশ্চয়ই তাই। তা হলে লোকটা একা থাকে না। ওর সঙ্গী ইন্দ্র এবং ঘোড়াটা। ওই ঘোড়া কী করে তাদের বাগানে চলে গিয়েছিল? যে পথ ভেঙে ওরা এখানে এসেছে, তাতে দূরত্বটা কম নয়! সে ঝুঁকে নীচটা দেখতে চাইল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাছপালা সব কিছু আড়াল করে রেখেছে। লোকটা ঘোড়াটাকে পেল কোত্থেকে? অমন শিক্ষিত ঘোড়া!

সায়ন ধীরে-ধীরে চলে এলো সেই দিকে, যেদিকে লোকটা তাকে নিষেধ

করেছিল যেতে। আর তখনই সে অবাক হয়ে গেল। সামনের চাতালের মতো অংশে বেশ বড়-বড় পাথর সাজানো আছে। সাজানো বলে মনে হলো, কেননা ওই বড় পাথরগুলো চমৎকার আড়ালের কাজ করছে। প্রকৃতি কি এইভাবে পাথর রেখে দেবে? আর সেই পাথরের ওপাশেই খাদ।

সায়ন ধীরে-ধীরে একটা পাথরের গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল। ওপাশে কিন্তু অনন্ত শূন্য নেই। পাহাড় এদিকে বেশ উঁচু। আর সেই পাহাড়ের কিছুটা জায়গা সমান, এবং সেখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে দু'পাশে। পিচ বা সুরকির পথ নয়, নেহাতই পায়ে-চলা পথ। কিন্তু বেশ চওড়া। গুহা থেকে জায়গাটার দূরত্ব সত্তর-আশি গজ হবে। ওখান থেকে চট করে কেউ এই গুহায় আসতে পারবে না, কারণ মাঝখানে ঘন জঙ্গলের বাধা রয়েছে। তা ছাড়া, সমস্ত পাহাড়ি জায়গাই যখন এক রকম, তখন অকারণ কেউ এখানে আসতে যাবেই বা কেন? তবু যাওয়া-আসার পথ ঢের বেশি সোজা হতো এইদিক ব্যবহার করলে। অথচ লোকটা নামা-ওঠা করে পেছন দিক দিয়ে। এদিকে এমন চিহ্ন রাখতে চায় না, যাতে বোঝা যায় কেউ এখানে বসবাস করে। কেন? তা হলে কি ওই পথ দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করে? এই জঙ্গলে তা হলে কি মানুষজন থাকে? সায়ন কিছুই বুঝতে পারছিল না। এই বন্যজন্তু এবং শ্বাপদে ঘেরা ভুটানি জঙ্গলে মানুষের কথা কল্পনা করা যায়? আর তখনই তার খেয়াল হলো সেই অশ্বারোহীদের কথা। সেই নিষ্ঠুর মুখের মানুষগুলো তো ঘোড়ায় চেপে এই সব পাহাড়ি জঙ্গলেই চলে এসেছিল। তারাই কি ওই পথে যাওয়া-আসা করে? তাদের সঙ্গে এই লোকটির কি কোনোও যোগাযোগ আছে? সায়ন মনে করে দেখল, লোকটার ভাবভঙ্গি রহস্যজনক। এবং কথাবার্তায় বেশ নেতা-নেতা ছাপ আছে। তাদের স্কুলে একটা ইংরেজি ছবি দেখিয়েছিল। কাউবয়দের নিয়ে গল্প। তাদের নেতার সঙ্গে যেন এই লোকটার মিল আছে।

পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সায়নের মনে পড়ল সেই অগ্নিচিহ্নের কথা।

এখানে যদি মানুষ না থাকে, তা হলে সেই সাংকেতিক আগুন জ্বালবে কে? বুধুয়া-বুড়ো যা দেখে শয়তানের ভয় পেয়েছিল—সেগুলোর পেছনে কি মানুষ আছে? সেই মানুষগুলো, যারা হাইওয়েতে ডাকাতি করছে, চা-বাগানে হামলা চালিয়েছে, সেই মানুষগুলোর সঙ্গে এই লোকটার যদি সংযোগ থাকে? সায়ন ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে? সে কি আর কখনও কুমুদিনীর কাছে ফিরে যেতে পারবে?

এখন এই দিনের বেলাতেও পাহাড় এবং জঙ্গলটাকে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। নীলচে একটা কুয়াশায় মাথামাখি চারধার। যদি সত্যি শয়তান বলে কেউ থাকে, তবে তার এই জায়গাটাকে দারুণ পছন্দ হবার কথা। হঠাৎ শরীর শিরশির করে উঠল সায়নের। সেই কালসাপ দুটোর মৃত্যুর সঙ্গে শয়তানের সম্পর্ক ছিল বলে মত দিয়েছিল বুধুয়া-বুড়ো। তাই কি শয়তান সাপ পাঠিয়েছিল এখানে? ইন্দ্র যদি না দেখত তা হলে কী হতো বলা যায় না। শয়তান না মানুষ, তাই নিয়ে ধন্দ থাকলেও সায়ন খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে ফিরে এলো গুহার মুখটায়।

এখানে হাওয়ার দাপট নেই। শোঁ-শোঁ বাতাস আঘাত করছে ওপাশে। এত জোরে বাতাস বইছে, তবু গাছের মাথাগুলো একটুও কাঁপছে না। ওরা রয়েছে নীচে, বাতাস বইছে অনেক ওপর দিয়ে। সায়নের আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। এই পরিষ্কার চাতালে চমৎকার ঘুমোনো যায়। কিন্তু সাহস হলো না ওর। যদি সাপের সঙ্গীটা এবার উঠে আসে। তার মনে হলো লোকটা কেন ফিরতে দেরি করছে। কিছু ফল নিয়েই তো চলে আসতে পারে। তা হলে তাকে এখানে একা-একা থাকতে হয় না। লোকটা যে-ই হোক না কেন, ও এলে তবু কথা বলা যায়, সাহস বাড়ে। এমন কী, ইন্দ্রটা থাকলেও হতো! সায়নের এবার শীত-শীত করছিল। অথচ এখন তো চা-বাগানে দারুণ গরম। দিনরাত ধুলো ওড়ে। সবাই মুখিয়ে আছে কখন বর্ষা আসবে!

সায়ন গুহার ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা সত্যি নিরাপদ। হাওয়া ঢোকে

না, শীত বা গরম নিশ্চয়ই কম লাগে। চারধারে শক্ত পাথরের দেওয়াল, ছাদ। যেন কোনোও নিপুণ শিল্পী খোদাই করে তৈরি করে দিয়েছে লোকটার জন্যে। দেওয়াল ধরে মাটিতে বসতে গিয়েও মত পালটাল সে। গুহার ভেতরটায় কী আছে? যদিও বেশি দূর আলো যাচ্ছে না, কিন্তু একেবারে ঘুটঘুটে তো মনে হচ্ছে না এখন। সে এক-পায়ে আরও এগিয়ে চলল। একটু যেতেই মনে হলো গুহার মেঝে সমতল নয়। ভেতর দিকটা বেশ ঢালু। এবং দু'পাশের দেওয়ালটা সরু হয়ে এসেছে। সে সাবধানে তাকাল। ছায়াঘন গুহাটায় চোখ সইয়ে নিতে একটু সময় লাগল। এবং তখনই সে দেখতে পেল, গুহার গায়ে একটা ব্যাগ ঝোলানো। তার নীচে কয়েকটা কাঠের পাত্র। তাতে সম্ভবত খাবার এবং জল ঢাকা। আর একটু ওপাশে স্লিপিং ব্যাগ জাতীয় কিছু গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তার মানে লোকটি এখানেই ঘুমোয়। এবং ওই ব্যাগটিই ওর একমাত্র সম্পত্তি। সায়ন আর একটু এগিয়ে গেল। ঝিরঝির বাতাস ঢুকছে গুহায়। সেটা আসছে এই পেছনের দিক দিয়েই। এবং তখনই গুহার শেষ প্রান্ত দেখতে পেল। ছোট্ট একটা ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে তাকালে নীচের গাছ তো বটেই, নদীটাকেও দেখা যায়। সিনেমার ছবির মতো, দুটো গাছের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া জল সুন্দর চোখে আসে। সায়ন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ওই নদীটায় সেই ভয়ঙ্কর জীবটি বাস করে। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে সে। ভাগ্যিস ঘোড়াটা লাফিয়ে তীরে উঠেছিল। কিন্তু এই পাহাড়ি জঙ্গলের নদীতে ওই রকম কোনোও প্রাণী বাস করতে পারে? কুমির? সায়ন ভাবতে পারছিল না।

শেষ প্রান্ত থেকে সে আবার ফিরে এলো। অনেক হয়েছে, এবার তার ঘুম পাচ্ছে।

দেওয়াল ধরে-ধরে ফিরে আসার সময় সায়নের চোখ পড়ল ব্যাগটার ওপর। ওই ব্যাগে কী আছে? লোকটা যদি অশ্বারোহীদের নেতা হয়, তা হলে তাকে যেমন করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। স্কুলে মিস

গল্প বলেছিলেন এক ধরনের নিষ্ঠুর মানুষের। তারা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে-দের লুকিয়ে রেখে চাপ দিয়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। এই লোকটি সেই প্রকৃতির কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু সেটা জানা যেতে পারে ওর ব্যাগ ঘাঁটলে। না বলে অন্যের জিনিস দেখা নিশ্চয়ই অপরাধ, কিন্তু এখন তো এ ছাড়া কোনোও উপায় নেই। ব্যাগটা পুরনো, খুবই পুরনো। ত্রিপল বা ওই ধরনের কিছুতে তৈরি খাকি রঙের শক্ত ব্যাগ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সায়ন। তারপর এক হাতে সেটাকে নামাতে গিয়ে দেখল বেজায় ভারী। তার বুক টিপটিপ করছিল। এই সময় যদি লোকটা উঠে আসে ওপরে এবং তাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়?

দ্রুত হাত চালাল সায়ন। কিছু ভালো কিন্তু খুব পুরনো জামা-প্যান্ট। একটা ডায়েরি। ডায়েরিটা খুলল সায়ন। প্রথম পাতায় সুন্দর বাংলা অক্ষরে লেখা সুধাময় সেন। ডায়েরির পরের পাতার লেখাগুলো এই আলোয় স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে না। সে ওটাকে রেখে দেবার আগে দেখল তারিখটা। বাইশে এপ্রিল, উনিশশো তেতাল্লিশ। সেই দিনকার কথা লিখেছে লোকটা, যার নাম সুধাময় সেন। চকচকিয়ে গেল সায়ন। সুধাময় সেনের বয়স কত?

এর পরেই হাতে ঠেকল একটা শক্ত কাগজ। সায়ন সেটাকে বের করে অবাক হয়ে গেল। লম্বায় দুই ইঞ্চি, চওড়ায় বড়জোর ইঞ্চি দেড়েক একটা পিচবোর্ডের ওপর ছবিটাকে আঠা দিয়ে সেঁটে রাখা হয়েছে। ছবিটাকে সে চেনে, খুব ভালো করে চেনে। না, ভুলে হলো, ছবির মানুষটিকে সে জানে, কিন্তু তার এই ছবিটি সে কখনও ছ্যাখে নি। একটা খবরের কাগজ বা ওই জাতীয় কিছু থেকে ছবিটাকে কাটা হয়েছে।

সায়ন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এই ছবি সুধাময় সেনের ব্যাগে আসবে কেন? এই রকম জীর্ণ হয়ে যাওয়া ছবি? দেখলেই বোঝা যায় কাগজটার রঙ জ্বলে গেছে। সায়ন এই ছবির মানুষটির গল্প অনেক পড়েছে। ওর

কথা শুনলে বুক ভরে যায়! হঠাৎ সচেতন হতেই সায়ন ছবি এবং অন্যান্য জিনিস ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ব্যাগটাকে আবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই একটা চিৎকার শুনতে পেল। চিৎকারটা মানুষের, সুধাময় ফিরে এসেছেন। চিৎকার করে ইন্দ্রকে ডাকছেন। দ্রুত ফিরে আসতে গিয়ে জখম পা অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতে ফেলতে গিয়েই সামলে নিল সায়ন। সে যখন গুহার মুখটায় চলে এসেছে, ঠিক তখনই সুধাময় সেনকে দেখতে পেল। একটা দড়ির ব্যাগে অনেকগুলো ফল নিয়ে সুধাময় ওর দিকে তাকিয়ে। একটু যেন জরিপ করে নিচ্ছেন। তারপর বললেন, "কোনোও অসুবিধে হয় নি তো?"

সায়ন মাথা নাড়ল, "না।"

"কী করছিলে এতক্ষণ?"

"কিছুই না।"

"গুহার ওপাশটায় যাও নি তো?"

সত্যি কথাটা বলতে গলা কাঁপল। অথচ মিথ্যে কথা বলতে সাহস এবং ইচ্ছে হলো না। সে নীরবে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

সঙ্গে-সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সুধাময় সেনের। কঠোর গলায় বললেন, "আমি অবাধ্যতা একদম পছন্দ কবি না। প্রত্যেকটি মানুষের ডিসিপ্লিন মানা উচিত এবং আদেশ মান্য করা প্রয়োজন। তুমি যদি আবার আমার কথার অবাধ্য হও তাহলে···"

সায়ন করুণ গলায় বলল, "আমি অবাধ্য হবার জন্যে যাই নি।"

"তা হলে কেন গিয়েছিলে?"

"ঘুরতে-ঘুরতে কৌতূহল হলো।"

"কৌতূহল! কৌতূহল দমন করতে শেখো। তোমাকে কেন ওদিকে যেতে নিষেধ করেছি তা জানো? সেটা জানতে কৌতূহল হয়?"

সায়ন কিছু বলল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সুধাময় হাতের জিনিস মাটিতে নামিয়ে গুহার মুখটায় ফিরে গেলেন,

“আগে এই পাহাড় জঙ্গল ছিল খুব শান্ত, নির্জন। কোনোও ঝামেলা ছিল না। জঙ্গলে থাকতে গেলে বন্যজন্তুর নিয়মকানুন জানলেই চমৎকার বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু সম্প্রতি···” কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন সুধাময় সেন। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললেন, “আমায় জিজ্ঞাসা না করে কখনও ওপাশে যেও না। অযথা বিপদ ডেকে এনে কী লাভ?”

সুধাময় সেন বাইরে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র ইন্দ্র লাফিয়ে গুহায় ঢুকল। সায়ন হনুমানটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। ওর হাতে এক ছড়া কলা। পাকা, পুরুষ্টু। সায়নের সামনে এসে সে কলাগুলোকে এগিয়ে ধরল। হনুমান বাঁদর কলা খেতে ভালবাসে, কিন্তু অন্য কাউকে সেটা খাওয়ায় বলে কখনও শোনে নি সায়ন। সে একটা পাকা কলা ছিঁড়ে খেতে গিয়ে সামলে নিল। তারপব আর-একটা কলা ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে ইন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইন্দ্রের চোখ খুশিতে ভরে উঠল। সে ছড়াটা নীচে রেখে দিয়ে কলাটা নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

সায়ন কলাটায় কামড় দিল। অত্যন্ত মিষ্টি, সুস্বাদু। সে ইন্দ্রের দিকে একটা হাত বাড়াতেই ও এক পা পিছিয়ে বসল। সায়ন বুঝল, ভাব হতে বেশি দেরি হবে না। সে আবার গুহার ভেতরটা দেখল। ব্যাগটা আবছা দেখা যাচ্ছে। সুধাময় সেন যদি জানতে পারেন, সে ওই ব্যাগ খুলেছিল! লোকটা খুব কড়া ধাতের। আর তখনই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে মানুষটাও তো খুব শক্ত ধাতের ছিলেন বলে শুনেছে সে। তার ছবি কেন থাকবে সুধাময়ের ব্যাগে! পুরো সামরিক পোশাকে সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন রেখে দিয়েছেন সুধাময় সেন এই গুহায়?

এখানে সন্ধে হয়ে গেলেও চট করে রাত নামে না। পায়ের নীচে জঙ্গলে যখন ঘুটঘুটে অন্ধকার তখন এই পাহাড়ের ওপর একটা মরা ছায়া নেতিয়ে থাকে। আকাশের নিজস্ব চোরা আলো আছে! বোধহয় সারাদিন সূর্যের আলো মেখে-মেখে সেটা তৈরি করে নেয় আকাশ। আর এই সময়ে সেই

আলোটা নেমে আসে পাহাড়ের গায়ে। চারপাশে রাতের আমেজ, পাখিরা চিৎকার করছে নীচের গাছের মাথায়, কোনোও নাম-না-জানা জন্তু ডেকে যাচ্ছে একটানা, আর সায়ন চুপচাপ তিরতিরে আলোয় বসে শুনছে, দেখছে। এই সময় ইন্দ্র শব্দ করে উঠতেই সে চোখ তুলল।

ইন্দ্রের হাতে কাঠের পাত্রগোছের কিছু। তাতে কিছু সেদ্ধ মাংস আর কলা। পাত্রটা নামিয়ে দিয়ে হনুমানটা নিঃশব্দে চলে গেল। সায়নের খেয়াল হলো অনেকক্ষণ লোকটাকে দেখতে পায় নি। ওর জিনিসপত্রে সে হাত দিয়েছিল এটা টের পেয়েছে কি না কে জানে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি দেখার পর থেকেই লোকটির সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে করছিল।

এখনকার মাংসটা নরম। কিন্তু কোনোও স্বাদ নেই। সামান্য নুন ছড়িয়ে দেওয়ায় খাওয়া যাচ্ছে এইমাত্র। সায়ন খাওয়া শেষ করে তাকিয়ে দেখল নীল আকাশের গায়ে তারা উঠেছে। ঠিক ছবির মতো। আকাশটা এত পরিষ্কার যে, মনে হচ্ছে কেউ যত্ন করে নিকিয়ে রেখেছে। তারাগুলো কেমন টলটল করছে।

সায়ন উঠল। তার পায়ের ফোলা এখন অনেক কম। কিন্তু ভর দেওয়া যাচ্ছে না পাতায়। বেশ ব্যথা আছে। গুহার মধ্যে ঢুকতেই মনে হলো দম বন্ধ হয়ে যাবে। তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে ভেতর থেকে।

"মিনিট পনেরো অপেক্ষা করো।"

ঘাড় ঘুরিয়ে সায়ন দেখল, লোকটি বসে আছে একটা পাথরে হেলান দিয়ে। তার হাতে ডায়েরি। কোনোও কলম বা পেনসিল চোখে পড়ছে না। সায়ন জিজ্ঞেস করল, "কিসের গন্ধ?"

"ধোঁয়ার। গুহার একদম শেষ প্রান্তে উনুন জ্বালি। মাংসগুলোকে সেদ্ধ করে খেতে হবে তো? ধোঁয়া যাতে এদিকে না আসে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গুহার মধ্যে ওটা জমে থাকে অনেকক্ষণ, পেছনের পথ দিয়ে অবশ্য খানিকটা বের হয়ে যায়। একদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বটে, কিন্তু উপকারও করছে। মশা থাকছে না।"

"বাইরে উনুন ধরান না কেন ?"

"বাইরে ?" লোকটি হাসল, "কদিন থাকলেই জানতে পারবে।" বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। সায়ন বুঝতে পারছিল না এর মধ্যে রহস্য কী থাকতে পারে।

তাকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি ডাকল, "এদিকে এসো। হাঁটতে পারছ এখন ?" হাত বাড়িয়ে পাশে বসতে ইঙ্গিত করল। সায়ন বসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স তোমার ?"

উত্তরটা শুনে হাসল লোকটা, "তোমরা যে জায়গাটায় থাকো তার নাম কী ?"

সায়ন নাম বলল। তারপর নিচু গলায় অনুনয় করল, "আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

"আমি তো তোমার বাড়ির পথ চিনি না।"

"আপনি ঘোড়ার পিঠে চেপে কোনোওদিন আমাদের চা-বাগানের দিকে যান নি ?"

"চা-বাগান ? ব্রিটিশদের চা-বাগান ? নাঃ।"

"ব্রিটিশদের হতে যাবে কেন ? ওটা আমাদের নিজস্ব চা-বাগান।"

"না, আমি এই জঙ্গলের দক্ষিণ দিকের পথ চিনি না, চিনতে চাই না।"

"কিন্তু আপনার ঘোড়াটা তো আমাদের বাগানে গিয়েছিল।"

"সেইটেই আমার কাছে অদ্ভূত লাগছে।"

"আপনি এই জঙ্গলে থাকেন কেন ?"

"সেটা খুব বড় গল্প। শুধু জেনে রাখো, ব্রিটিশরা আমাকে পেলে ছাড়বে না। তোমার এখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগল ?"

লোকটির চোখে উদ্বেগ।

"অনেকক্ষণ।"

"এইটেই আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে। জঙ্গলটা এত ছোট হয়ে গেল কী করে ! আমি তো জানতাম ইণ্ডিয়া এখান থেকে অন্তত দু'দিনের পথ।"

লোকটি স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন।

"ইণ্ডিয়া ? ভারতবর্ষ বলুন।"

"ব্রিটিশরা তো ইণ্ডিয়া বলে। সেটা শুনতেই অভ্যস্ত ছিলাম। বাড়িতে তোমার আর কে কে থাকেন?" লোকটি যেন প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছিল।

"মা আর বাবা। আমি অবশ্য হোস্টেলে থাকি।"

"তাই। এখানে এসে তুমি কান্নাকাটি করো নি, কেননা তোমার মা-বাবাকে ছেড়ে থাকার অভ্যেস আছে। আজ কত তারিখ জানো ?"

সায়ন মনে করার চেষ্টা করল। এই একদিনেই সব গুলিয়ে গেছে যেন। তারিখটা শুনে চমকে উঠল লোকটা। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে। তারপর অবিশ্বাসী স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো ? এটা উনিশশো পঁচাশি ?" লোকটার চোখ-মুখ কেমন বদলে গেল।

সায়ন করুণ স্বরে বলল, "আমি রসিকতা করব কেন আপনার সঙ্গে ?" আপনি একটা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেই জানতে পারবেন।"

"ক্যালেণ্ডার ? এখানে ক্যালেণ্ডার পাব কোত্থেকে ? এটা পঁচাশি সাল ? আশ্চর্য !" মনে-মনে যেন হিসেব চলছিল।

সায়নের মনে হলো লোকটার চেহারায় বেশ বিমর্ষ ছায়া নামছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে কত দিন আছেন ?"

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটি। তারপর ঠোঁট চেটে বলল, "চল্লিশ বছরের বেশি।" চোখ বন্ধ করে নিশ্বাস নিল লোকটি। তারপর নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "গান্ধীজি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"গান্ধীজি ?"

"তুমি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম শোনো নি ?"

সায়নের মনে পড়ল। দোসরা অক্টোবর তাদের স্কুল ছুটি থাকে। সে বলল, "ও মহাত্মা গান্ধী ? উনি তো মারা গেছেন। ওঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল।" ইতিহাসের বই নয়, বাবার কিনে দেওয়া মনীষীদের জীবনীটা

মনে করল সায়ন। সে লক্ষ্য করল লোকটির মুখ হাঁ হয়ে গেল, "কী বলছ, তুমি! ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত ওঁকেও গুলি করে মেরেছে?"

"বাঃ, ইংরেজরা মারতে যাবে কেন? আপনি কি কোনোও খবর রাখেন না?" সায়ন প্রশ্নটা করামাত্র লোকটি খপ করে তার হাত ধরল, "বিশ্বাস করো, চল্লিশটা বছর আমি এই রকম পাহাড়ে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। দেশে কি হয়েছে না হয়েছে, আমি কিছুই জানি না। কে মেরেছে গান্ধীজিকে?"

"নাথুরাম গড্‌সে বলে একজন।"

"কেন?"

এবার হোঁচট খেল সায়ন। নাথুরাম কেন মেরেছিল সেই খবর বইটাতে ছিল না। সে বলল, "আমি অত জানি না। উনি যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন মারা হয়েছিল।"

"জওহরলাল ছিলেন না? তিনি কী করছিলেন? ভাবতেই পারছি না। এখন কি দেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনোওরকম আন্দোলন হয় না?"

লোকটির মুখে অদ্ভুত একটা অবজ্ঞা দেখতে পেল সায়ন। কিন্তু প্রশ্নটা শুনে সে আরও অবাক হলো, "ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে যাবে কেন? এখন তো আমাদের দেশ স্বাধীন।"

"স্বাধীন!" চমকে উঠল লোকটি, "কী বলছ তুমি? ভারতবর্ষ স্বাধীন?"

"এ মা! কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।" গর্বিত গলায় বলল সায়ন।

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল লোকটি। তারপর খপ করে সায়নের জামার কলার মুঠোয় ধরে টেনে আনল কাছে, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করলে ফল খুব খারাপ হবে। সত্যি কথা বলো।"

সায়ন খুব অবাক হয়ে গেল এই রকম ব্যবহারে। সে হাঁসফাঁস করতে-করতে বলল, "আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন? আপনি যে-কোনোও

লোককে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন সত্যি বলছি কি না।"
লোকটির হাতের মুঠি আলগা হলো। যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে এমন ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। সায়নের খুব রাগ হচ্ছিল তাকে ওইভাবে ধরার জন্য, কিন্তু কান্না দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেল। ওই রকম বৃদ্ধ মানুষ, যদিও বৃদ্ধ মনে হয় না, কিন্তু বয়স হয়েছে একথা ঠিক। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে-ফুলে কাঁদছে, দেখতে তার খুব খারাপ লাগছিল।
কিছুক্ষণ বাদে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে?"
নিজেকে সংযত করতে লোকটার অনেক সময় লাগল। তারপর নিজের মনেই বলল, "উনিশশো পঁচাশি। তার মানে আটত্রিশ বছর হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেছে, অথচ আমি তার কিছুই জানি না। আমি ভাবতাম এখনও আমরা পরাধীন।"
বড় একটা নিশ্বাস ফেলল সে। খুব করুণ দেখাচ্ছিল তাকে।
এই সময় শব্দ উঠল। কোন্ ফাঁকে রাত নেমেছে আকাশে। সেই চোরা আলো শুষে নিয়েছে নীল অন্ধকার। অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জন হয়ে গেছে চরাচর। আর এসব লক্ষ্যই করে নি সায়ন। এখন শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র সে মুখ ফেরাল। আর তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লোকটি। পা বাড়াতে গিয়েও ফিরে এসে ফিসফিস করে বলল, "এখান থেকে এক পা-ও নোড়ো না। যদি ঘুম পায় গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়তে পারো। ওখানে আর গন্ধ নেই। যারা শব্দ করছে তারা খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ।" কথাগুলো বলেই নিঃশব্দে সরে গেল লোকটি। সায়নের মনে হলো এই মানুষটির সঙ্গে একটু আগে যে মানুষ কাঁদছিল তার কোনোও মিল নেই।
শব্দটা মিলিয়ে গিয়েছিল। সায়নের খুব কৌতূহল হচ্ছিল। পাহাড়ের যে-দিকটায় যেতে লোকটা নিষেধ করেছে, সেই দিকে গেলেই বোধহয় ব্যাপারটা দেখা যাবে। কিন্তু লোকটা যদি ওখানে থাকে? নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবে। এবং এই জঙ্গলে যদি তাকে একা ছেড়ে দেয়, তা হলে আর
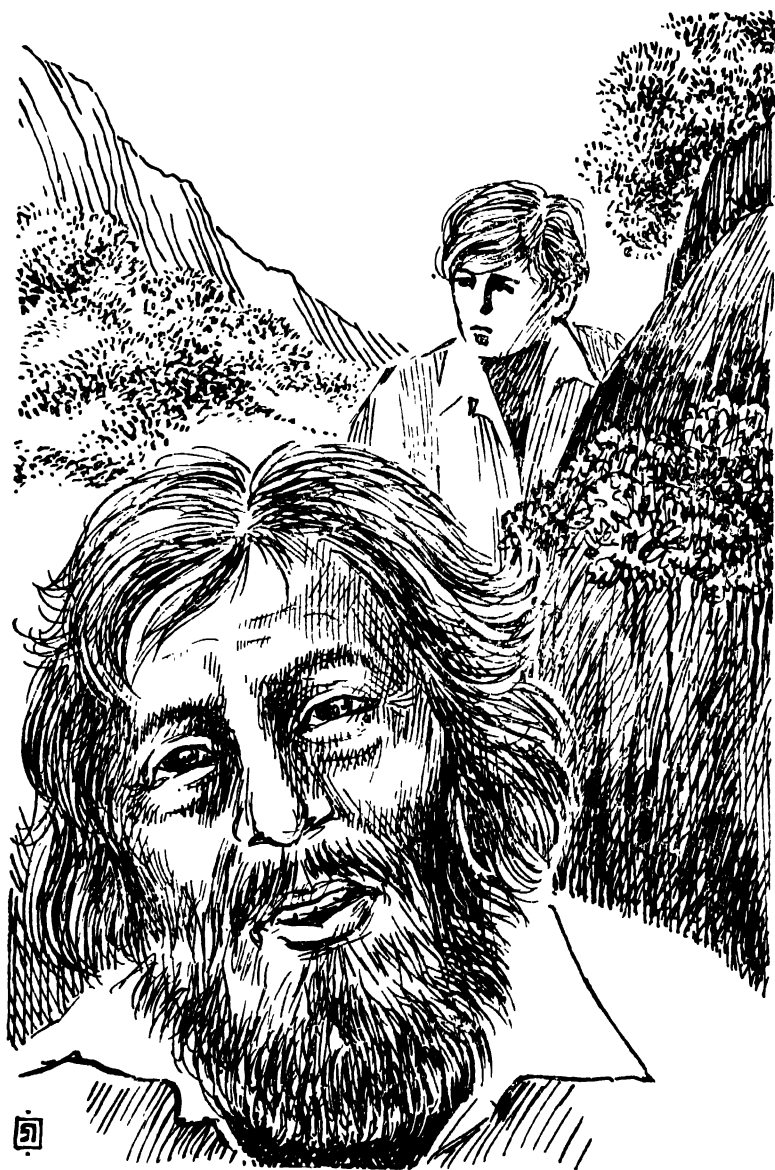
রহস্যময় মানুষ সুধাময় বললেন—১৯৮৫ সাল···তার মানে আটত্রিশ বছর আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেছে, অথচ আমি তার কিছু জানি না···

দেখতে হবে না। কিন্তু লোকটা কে? যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবি রাখে, সে জানে না ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে? এটাই আশ্চর্য ব্যাপার? এমনকি গান্ধীজির মৃত্যু সংবাদটাও জানত না! এবার নিজের বোকামিটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। যে সাতচল্লিশ সালের ঘটনা জানে না, সে কী করে আটচল্লিশ সালের কথা জানবে? তার মানে লোকটি এতগুলো বছর ধরে জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সভ্য জগতের সঙ্গে তেমন কোনোও সম্পর্ক নেই। আবার নেই বা বলা যায় কী করে? কাঠের যে পাত্রগুলোয় খাবার দেওয়া হয়েছিল তা ও পেয়েছে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই আগাগোড়া নেই ওগুলো! সায়নের ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না।

ঠিক তখন আবার শব্দ উঠল। যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ। কান খাড়া করে শুনে তেমনই মনে হলো সায়নের। যেন ছুটে-ছুটে অনেকটা পথ এসে আচমকা থেমে গেল পা'গুলো। সায়ন উঠল। তারপর সন্তর্পণে পাহাড় ধরে এগোতে লাগল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার, কিন্তু চোখ সয়ে যাওয়ায় দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না তার। সে উঁকি মেরে দেখল লোক-টিকে দেখা যাচ্ছে কি না। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও তার অস্তিত্ব টের পেল না। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে সায়ন ইন্দ্রকে দেখতে পেল। একটা উঁচু পাথরের ওপর সজাগ ভঙ্গিতে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে আরও একটু সাহসী হলো। ঠিক তখনই ইন্দ্র ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। এবং দেখামাত্র মুখ বিকৃত করে এমন শব্দ করে উঠল যে, দু'পা পিছিয়ে এলো সায়ন।

হনুমানটা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সায়নের মুখের ওপর থেকে সরছে না। সায়ন ভয় পেল। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে কয়েক পা এগিয়ে গেলে ও কামড়ে দিতেও পারে। সে ধীরে-ধীরে পিছিয়ে এলো। তারপর গুহার মুখটায় ফিরে নিশ্বাস নিল। লোকটি কি ইন্দ্রকে পাহারা দেবার কাজে রেখে কোথাও গিয়েছে। যে ইন্দ্র তাকে খাবার দিয়েছিল তার সঙ্গে এই মুখ-ভ্যাংচানো ইন্দ্রের কোনোও মিল নেই। লোকটি গেল

কোথায় ? ওই শব্দের সঙ্গে কি কোনোও যোগাযোগ আছে ? সায়ন মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিল না। সে স্থির করল পা ঠিক হয়ে গেলেই এখান থেকে পালিয়ে যাবে। ওই নদীটা পেরিয়ে যেতে পারলে পায়ে হেঁটে-হেঁটে একসময় ঠিক চা-বাগানে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর যদি কোনোওরকমে সেই ঘোড়াটাকে ম্যানেজ করা যায় তা হলে তো কথাই নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই, চোখ মেলতেই সায়নের খুব শীত করতে লাগল। এখন নিশ্চয়ই অনেক রাত। একটা বুনো জন্তু ডেকে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। আকাশের তারাগুলো পর্যন্ত মনে হয় আলগা হয়ে এসেছে। সায়ন উঠে বসল। এবং তখনই সে লোকটাকে দেখতে পেল। একটা পাথরে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে এখন ওকে। এত রাত্রেও লোকটা ঘুমুচ্ছে না কেন ? সায়ন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠল। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা চোখ জ্বলছে। ঠিক একচোখো রাক্ষসের মতো। আগুনটা এখন ছোট হয়ে এসেছে, যেন কুমুদিনীর মাথার সিঁদুর-টিপের আয়তন নিয়েছে। নির্ঘাত অনেকক্ষণ জ্বলতে-জ্বলতে এখন আগুন নিভে যাওয়ার অবস্থায় এসেছে। সায়ন চমকে উঠল। বুধুয়া-বুড়ো যাকে বলত শয়তানের চোখ, এও কি সেই রকম ? এই আগুনই কি সে তাদের বাংলোর বারান্দা থেকে দেখতে পেয়েছিল ? তা হলে তো তাদের বাগান থেকে এই জায়গার দূরত্ব খুব বেশি নয়। চেয়ে থাকতে-থাকতে আগুনটা টুপ করে নিভে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পাহাড়টায় ধুম-অন্ধকার ছড়িয়ে গেল।

"ঘুম ভেঙে গেল সায়ন ?"

প্রশ্নটা শুনে সায়ন লোকটির দিকে তাকাল। তারপর বলল, "আমাকে বাড়িতে যেতে দিন।"

"আমি তো তোমাকে আটকে রাখি নি। তোমার পা ঠিক হলে যদি যেতে পারো তো চলে যাও, আমি কিছু বলব না।" লোকটা উদাস গলায় বলল।

"আপনার ঘোড়াটা আমাদের বাগানের পথ চেনে।"
"সে নেই। আজ একটা গোখরোর কামড়ে বেচারা মরে গেছে।"
"মরে গেছে?" চমকে উঠল সায়ন। ওই ঘোড়াটা তার জীবন বাঁচিয়েছিল। তাকে একটা গোখরো সাপ মেরে ফেলল!
"সায়ন, এখানে এসো।" লোকটি তাকে খুব নরম গলায় ডাকল। সায়নের মনে হলো ঘোড়াটা মারা যাওয়ায় খুব দুঃখ পেয়েছে লোকটি। তা হলে তখন যে পায়ের শব্দ হচ্ছিল তা এই ঘোড়াটারই? তাই যদি হয় লোকটি কাদের কথা বলে সতর্ক হচ্ছিল? কিন্তু এসব চিন্তা না প্রকাশ করে সে লোকটির সামনে গিয়ে বসতেই দেখল ইন্দ্র একপাশে খুব আরাম করে ঘুমুচ্ছে। লোকটি বললে, "তুমি বললে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। তা এখন সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক কে? জওহরলাল নেহরু?"
"রাষ্ট্রনায়ক?" চট করে অর্থটা বুঝতে পারল না সায়ন।
"দেশের নেতা। রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী। নেহরুর তো হওয়ার কথা।"
"জওহরলাল নেহরু তো অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর জন্মদিনে আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠান হয়। এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজীব গান্ধী।"
"তিনি কে? লোকটি খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।"
"জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীর ছেলে।" এত সাধারণ সংবাদ লোকটি জানে না বলে বেশ মজা লাগছিল সায়নের। সে এবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো কোনো খবর রাখেন না? আপনি কে?"
লোকটি ছোট চোখে সায়নের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। এইটুকু বয়সে তুমি কত কিছু খবর রাখো। তা ছাড়া আচমকা ঘোড়ার পিঠে চেপে এই অজানা জঙ্গলে এসে পড়েও তুমি ঘাবড়ে যাও নি। খুব ভালো। তুমি এলে বলেই আমি কতদিন পরে বাংলা কথা বলার সুযোগ পেলাম। জানো, আমি যাতে মাতৃভাষাটা না ভুলে যাই তাই নিয়মিত নিজের সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে, এই গাছ-পাহাড়ের সঙ্গে

জোরে-জোরে বাংলায় কথা বলে যেতাম। তুমি এলে বলে আমার খুব ভালো লাগছে। তোমাকে সব কথা বলা যায়।"

লোকটি নিশ্বাস নিল। মনে হচ্ছিল ওর বুক খুব ভারী হয়ে গেছে কোনোও কারণে, একটানা কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল তাই। লোকটা কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারাগুলোকে দেখলে মনে হবে এই বুঝি খসে পড়ল। রাত যত শেষ হয়ে আসে তত তারাগুলো আঠা শেষ হয়ে যাওয়া টিপের মতো আলগা হয়ে যায়। লোকটি সেইভাবেই মুখ তুলে বলল, "আমার নাম সুধাময় সেন। কলকাতার দর্জিপাড়ায় আমার বাড়ি ছিল।"

"আপনি এই জঙ্গলে—"

"প্রশ্ন করো না। আমাকেই বলতে দাও। বার্মাতে আমার মামার বাড়ি ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তখন ভারতবর্ষে তুমুল আন্দোলন চলছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। একদিকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা প্রাণ দিচ্ছে প্রাণ নিচ্ছে। অন্যদিকে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন করছেন। আমি যাতে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ি তাই আমাকে বার্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেইখানে একদিন শুনলাম সুভাষচন্দ্র ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করছেন। সময় নষ্ট না করে আমি যোগ দিলাম ফৌজে। আমরা লড়াই করেছি শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে। তারপর জঙ্গলে থাকতেই খবর পেলাম আমরা হেরে গেছি। ব্রিটিশরা বেধড়ক পিটিয়েছে আমাদের। বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে কোর্ট মার্শালের জন্যে। প্রাণ থাকতেও ধরা দেব না বলে পালালাম। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা-একা পালিয়েই বেড়াচ্ছি বছরের পর বছর, জঙ্গল আর পাহাড়ে। জানতাম আমাকে পেলে ব্রিটিশরা ছাড়বে না। ওদের একটা ঘাঁটি আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম যে। ভারতবর্ষের দিকে যেতে আমি সাহস পাই নি ভাই।"

কথা শেষ করে ঠোঁট কামড়ালেন সুধাময় সেন।

অবাক হয়ে শুনছিল সায়ন। এবার ফশ করে জিজ্ঞেস করল, "আপনি

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখেছেন।”

সুধাময় সেন মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি।”

কাল রাত্রে কখন ঘুম এসেছিল সায়ন নিজেই জানে না। এই জঙ্গলে পাহাড়ের ওপরে ঘড়ি থাকার কথাও নয়। ঘড়ি দেখে এখানকার জীবন চলেও না। তবে মনে আছে সুধাময় সেনের মুখে গল্প শুনতে শুনতে আকাশের তারাগুলো যেন রঙ পালটে ফেলেছিল। সন্ধ্যেবেলায় আকাশটা থাকে স্নিগ্ধ নীল শাড়ির মতো আর তারারা তার গায়ে নীল আলো ফেলে সেঁটে থাকে। কিন্তু রাত গড়িয়ে গেলে আকাশটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়, আর তাবাগুলোকে দেখলে মনে হয় এই বুঝি খসে পড়ল। হলদেটে ভাব মাখামাখি হয় তাদের গায়ে। সায়নের মনে আছে, তার ঘুমোবার আগে আকাশটা যেন ওই রকম হয়ে গিয়েছিল।

সুধাময় সেন গল্প বলতে জানেন। সুভাষচন্দ্র বসু কীভাবে সাবমেরিনে চেপে সাত-সমুদ্র পেরিয়ে চলে এলেন পূর্বদেশে, এসে সংগঠিত করলেন ভারতবর্ষের প্রথম মুক্তিবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ, সেই গল্প শুনতে-শুনতে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল সায়ন। এমন অনেক কাহিনী সে শুনল, যা এর আগে কেউ তাকে বলে নি বা কোনোও বইতে পড়ে নি। আর এই সব শুনতে-শুনতে রাতটা জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ নিয়ে রহস্যময় হয়ে উঠল এবং ঘুম অক্টোপাসের মতো তাকে ঘিরে ফেলল কোন্ অসাবধানতায়, তা সে নিজেই জানে না।

এখানে সকাল হয় রমরমিয়ে। গাছে-গাছে পাখিরা তো বটেই, কচি কলা-পাতার মতো ভোরের রোদও যেন কলকলিয়ে ওঠে। সেই সময় মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনোও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, সর্বত্র একটা সুখের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে সায়নের মাথায় কোনোও ভাবনা কাজ করছিল না। একটু আগে ঘুম ভাঙার পর থেকেই সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল আকাশ এবং পৃথিবীর দিকে। তাদের চা-বাগানের বাংলোয় সকাল

আসে পায়ে-পায়ে, কিন্তু এমন রাজার মতন নয়।

এই সময় সুধাময় সেন তার সামনে এসে দাঁড়ালেন, "এখানকার সকালটা খুব সুন্দর, তাই না ?"

সায়ন নীরবে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

সুধাময় বললেন, "এখানকার সবকিছুই বেশ সুন্দর। কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল ?"

"হ্যাঁ।" কথাটা বলেই সায়নের মনে পড়ল এখন তার ব্রাশ করার কথা। কিন্তু পেস্ট কিংবা টুথব্রাশ পাবে কোথায় সে ? আর তখনই বাড়ির কথা মনে পড়ল। বুকের মধ্যে ঘুমন্ত কান্নাটা জেগে উঠল। সে স্পষ্ট গলায় বলল, "আমি বাড়ি যাব।"

সুধাময় বললেন, "আমি তোমার বাড়ির পথ চিনি না। যে চিনত সে চলে গিয়েছে। তোমাকে যেতে হলে একাই যেতে হবে। তুমি কি আজই যেতে চাও !"

সায়ন কথা বলল না। তার পক্ষে কি একা ফেরা সম্ভব ? নদীটা পার হতে হবে। সেখানে খুব বড় কোনোও প্রাণী আছে যেটা ঘোড়াটার গন্ধ পেয়ে তেড়ে এসেছিল। তারপর সেই জঙ্গলে হাতি, সাপ এবং হায়েনা। এ ছাড়া আর কি আছে তা জানা নেই। সবচেয়ে মুশকিল হলো, সে পথটাই চেনে না। সুধাময় সেন বললেন, "তার চেয়ে আমি বলি কী, তুমি এখানে কিছুদিন থাকো। জায়গাটার সঙ্গে মানিয়ে নাও। জঙ্গলটার চরিত্র বোঝো। তারপর—" এই অবধি বলে সুধাময় যোগ করলেন, "তুমি আমাকে একটা সুখবর দিয়েছ। ভারতবর্ষ স্বাধীন। ইংরেজরা নেই। কিন্তু আমি আর সেখানে গিয়ে কী করব ? এত দিন এই নির্জনে থেকে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর বোধহয় সেখানে গিয়ে আমি মানাতে পারব না।" ওঁর বুক নিংড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কোনোও আত্মীয়স্বজন নেই ?"

"উঁ।" অন্যমনস্ক ছিলেন সুধাময়। তারপর মাথা নেড়ে না বললেন।

এই সময় ইন্দ্র এসে তাঁর পাশে বসতেই তিনি হাত রাখলেন ওর মাথায়, "এই এরাই আমার আত্মীয়। ওহো, তোমার পা কেমন আছে আজ? হাঁটতে পারবে?"

নিজের পায়ের কথা খেয়ালেই ছিল না, সায়ন এবার সাহস করে উঠে দাঁড়াল, "একটু অস্বস্তি ছাড়া তেমন কোনোও ব্যথা নেই। চাপ দিলেও লাগছে না।"

সুধাময় খুশি হলেন, "যাক তা হলে ভাঙে-টাঙে নি। এখানে তেমন কিছু হলেই ভীষণ বিপদ।"

"আপনি এত বছর এখানে আছেন, কোনোও অসুখ-বিসুখ করে নি?"

"করেছে। এমনও হয়েছে, জ্বরে পাঁচদিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে থেকেছি। তবে আস্তে-আস্তে জেনেছি, প্রকৃতি এই জঙ্গলে অনেক রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই পাহাড় এবং জঙ্গলটাকে ভালবাসলে এমন সব মজাদার ব্যাপার জানতে পারবে যে, আর কখনও তোমার মন খারাপ লাগবে না। আমার তো অনেক বয়স হলো, কিন্তু খুব বুড়ো দেখাচ্ছে কি? অ্যাঁ? এখনও কী খাটাখাটনি করতে পারি।" নিজের শরীরটার দিকে তাকালেন সুধাময়।

দাঁত না মেজে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগছিল না। সায়ন সেই কথাটা বলল।

সুধাময় চোখ বড় করলেন, "ও, এই কথা!" তারপর উঠে গুহার ভেতরে ঢুকে একটা সরু গাছের ডাল নিয়ে এলেন, "এইটে চোখে পড়ে নি তোমার?"

সায়নের মনে পড়ল না, সে ডালটাকে দেখেছে কি না। মাথা নাড়তেই সুধাময় বললেন, "এইটে ঠিক নয়। জঙ্গলে বাস করতে গেলে তোমাকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে সবসময়। এটা হচ্ছে নিমগাছের ডাল। ভেঙে নিয়ে ব্রাশ করো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দাঁতন।"

নিম-দাঁতন মোটেই অচেনা নয় সায়নের। বকুলকে সে রোজই ওটা দিয়ে

দাঁত মাজতে দেখেছে। মাঝে-মাঝে তারও ইচ্ছে হতো, কিন্তু মায়ের ভয়ে সেটা সম্ভব ছিল না। এখন ব্রাশের সাইজে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে মুখে পুরল সায়ন। সুধাময় বললেন, "প্রথমে ডগাটা চিবিয়ে ছিবড়ে করে নাও, আর রসটা বের হলে ফেলে দিও। খুব তেতো।"

সুধাময় সেন গুহার ভেতরে চলে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রও অদৃশ্য হলো। দাঁত মাজতে-মাজতে পায়চারি করছিল সায়ন পাথরের ওপরে। না, আর পায়ে লাগছে না তার। এবং তখনই মনে হলো গতরাত্রে উলটো দিকের রাস্তাটায় কী হয়েছিল? কারা এসেছিল? সুধাময় তাকে সরে আসতে বাধ্য করেছেন, কিন্তু মনে হলো কিছু একটা রহস্য আছে যা উনি তার কাছে চেপে যাচ্ছেন। মানুষটি এমনিতে খুব ভালো। একটা লোক সঙ্গী-বিহীন হয়ে এত বছর জঙ্গলে আছেন, কিন্তু তেমন বুনো হয়ে যান নি। কারণ ওঁর হাতের নখগুলো মোটেই বড় নয়। জামা-প্যান্ট কি এতগুলো বছরে ঠিক রাখা সম্ভব? চুল অবশ্য বেশ বড়, কিন্তু সেটা তো এখন পিঠ ছাড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য সায়ন জানে না ছেলেদের চুল বাড়তে দিলে কতটা বড় হয়! কিন্তু তার মনে হচ্ছিল কোথাও যেন একটা গোলমাল আছে। সুধাময় সেন যদি এই জঙ্গলে বাস করেন এত বছর, তা হলে তিনি এখনও সভ্য আছেন কী করে! কিন্তু ওঁকে এই প্রশ্নটা করা যাবে না। তার কথা বিশ্বাস করছে না জানলে যদি রেগে যান?

হঠাৎ সায়নের খেয়াল হলো তার চারপাশে হরেক রকম পাখি। বেশির-ভাগ চড়াই। তবে টিয়া এবং বদরিও আছে। পাখিরা তাকে ঘিরে পাথরের ওপরে বসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এবং ওরা এত কাছে যে হাত বাড়ালেই ধরা যায়। পাখিগুলো মোটেই ভয় করছে না তাকে।

এই সময় শব্দ করে উঠল ইন্দ্র। আর তাকে দেখামাত্র পাখিদের যেন উৎসাহ বেড়ে গেল। সায়ন অবাক হলো। ইন্দ্রের হাতে কাঠের পাত্র। তা থেকে মুঠো করে দানাজাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, আর পাখিরা তাই হুটোপুটি করে খাচ্ছে। মজা লাগল খুব। ইন্দ্রের ভঙ্গি ঠিক মানুষের

মতো। যেন ধামায় করে খাবার এনে খাওয়াচ্ছে পোষা জীবদের। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল সুধাময় গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ব্যাপারটা দেখছেন। চোখাচোখি হতে বললেন, "এগুলো সব পোষা পাখি। রোজ সকালে খাবার না পেলে মাথা খারাপ করে দেবে।"

"পোষা পাখি মানে?"

হেসে ফেলল সুধাময়, "যে ডাকলে আসে, খিদে পেলে খেতে চায়, খাবার দিলে খুশি হয়, সে তো পোষাই। প্রকৃতিতে ছাড়া থাকে এই মাত্র। তোমার দাঁতন হয়ে গেছে? এখানে জল তুলেছি এইমাত্র। মুখ ধুয়ে নিতে পারো। এখন তুমি সুস্থ। নিজের কাজ নিজেই করবে। প্রথম দিন বলে আমি জলটা তুলে দিলাম। তুমি দেখবে এসো, কী কায়দায় আমি জল তুলি এখানে।" ইশারা করে ভেতরে চলে যেতেই সুধাময়কে অনুসরণ করল সায়ন।

গুহার শেষে যে ছোট্ট ফোকরটি রয়েছে, তার মুখেই বসানো রয়েছে একটা কাঠের গোল লাঠি। লাঠির গায়ে অদ্ভুত ধরনের দড়ি বাঁধা। দড়ির প্রান্তে কাঠের পাতলা পাত্র। সুধাময় পাত্রটিকে ফোকরের বাইরে ফেলে লাঠিটাকে ঘোরাতে-ঘোরাতে বললেন, "চেয়ে ছাখো, দড়ি আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমার বালতিটা নীচে নেমে যাচ্ছে। ওখানে নদী থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাঁকে পরিষ্কার জল আছে। বালতিটা সোজা সেই জলে গিয়ে পড়বে। বালতির নীচে একটা পাথর বাঁধা আছে। জলে পড়লেই ওটা ডুবে যাবে। তারপর আবার উলটো দিকে ঘুরিয়ে জল-ভর্তি বালতিটাকে টেনে তুলতে হবে ওপরে। মাঝে-মাঝেই গোলমাল করে, কিন্তু বেশ কাজ চলে যায়। এখানে তো কপিকল পাওয়া যাবে না, তাই এই বন্দোবস্ত করে নিয়েছি।"

ততক্ষণে জল নিয়ে কাঠের বালতিটা ওপরে উঠে এসেছে। সায়ন হাত বাড়িয়ে সেটাকে ভেতরে নিয়ে এলো। সুধাময় বললেন, "মুখ ধুয়ে বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। ওই কোণে একটা গর্ত আছে, জল ঢাললে বেরিয়ে

যায়। তুমি এখানেই সেরে নাও।"

সুধাময় চলে গেলে সায়ন মুখ ধুয়ে ফোকর দিয়ে দাঁতনটা বাইরে ছুঁড়ে দিল। আবছা অন্ধকারে তার নজরে পড়ল ডান দিকে গুহার মধ্যে আলমারির মতো খানিকটা জায়গা রয়েছে। সেখানটায় বেশ কিছু জিনিসপত্র রেখেছেন সুধাময়। অর্থাৎ ওইটেই তাঁর স্টোর-রুম। পরিষ্কার হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সুধাময় বললেন, "প্রাকৃতিক কাজের জন্যে এখানে আলাদা ব্যবস্থা নেই। বিশাল প্রকৃতি পড়ে আছে, জনমানবশূন্য, অতএব লজ্জা পাবার কোনোও কারণ নেই।" কথাটা বলতে-বলতে একটু থমকে গেলেন তিনি, "প্রবলেম হবে তোমার জামাকাপড় নিয়ে একেবারে এক-বস্ত্রে চলে এসেছ। কী করা যায়?"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল সায়ন, "আমি মোটেই এখানে আসতে চাই নি। আপনার ঘোড়াটাই জোর করে আমাকে এখানে নিয়ে এলো!" কথাগুলো বলার সময় পায়ে অস্বস্তি হলো। সায়ন দেখল, থেঁতলে যাওয়া অংশটায় কালচে ছাল পড়েছে। সেগুলো শুকিয়ে আসায় টান ধরেছে।

সুধাময় বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমার তো দেখছি মেজাজ খুব। সব সময় কথার সরল মানে ধরাই ভালো। যাক, যা বলছিলাম তুমি বরং এক কাজ করো। তোমার তো আণ্ডারপ্যান্ট আছে?"

সায়ন একটু লজ্জিত হলো। সে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

সুধাময় বললেন, "এখানে যখন থাকবে, তখন ওইটে পরে থেকো। না, না, লজ্জার কোনোও কারণ নেই। আমি দেখছি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমি তো তুমি আসার আগে দিনের পর দিন কষ্ট করে থেকেছি। না হলে এই জামা-প্যান্ট বাঁচত?"

একটু পরেই খাবার এলো। আর আজ সায়নের মনে হলো, গরম দুধ কতকাল সে খায় নি। গোটা তিনেক ফল খেয়ে সকাল শুরু করতে হবে, এটা কে ভেবেছিল। সুধাময় বললেন, "মাংস আমরা দু'বেলা খাই। বাকি সময় ফল। অবশ্য রোজ মাংস খেতে ভালো লাগে না।"

'নদীতে মাছ নেই ?"

'আছে। কয়েক বছর আগে ধরেওছিলাম। কিন্তু আঁশ ছাড়ানো খুব ঝামেলার ব্যাপার। তা ছাড়া সেদ্ধ করলেই যেমন মাংসটা খাওয়া যায়, মাছ তো তেমন ভাবে যায় না। এবার আমরা বের হব। তুমি তা হলে—"

সুধাময়ের কথা শেষ না হতেই সায়ন বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাব।"

ব্যাপারটা যেন পছন্দ হলো না সুধাময়ের। বললেন, "তোমার অসুবিধে হবে। জঙ্গলের পথ তো পিচ-ঢালা নয়। খুব সাপখোপ চারপাশে।"

'তা হোক। আমার এখানে একা চুপ করে বসে থাকতে মোটেই ভালো লাগবে না। তা ছাড়া আপনি তো একটু আগে বলেছেন যে, জঙ্গলের সঙ্গে মানিয়ে না নিলে আমি বাড়িতে ফিরতে পারব না! আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

'তুমি নামতে পারবে ?"

'আমাকে দেখিয়ে দিন।"

সুধাময় সায়নকে ছোট চোখে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন। তারপর বললেন, 'বেশ। এসো।"

গুহার ভেতর থেকে কয়েকটা অস্ত্র নিয়ে এসে একটা ভোজালির মতো জিনিস সায়নের হাতে দিলেন সুধাময়, "এটাকে সাবধানে কোমরে ঝুলিয়ে রেখো। তোমার এই পোশাক পরে যাওয়াটা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ওতে জঙ্গলে বেশ অসুবিধে হয়। তবে প্রথম দিন তুমি নিজেই বুঝে নাও। সব সময় কান খাড়া রাখবে আর জানবে জঙ্গলে কেউ তোমার বন্ধু নয়।"

উলটো দিকের পাহাড়ের ধারে চলে এলো ওরা। এখান থেকে খাড়াই নেমে গেছে। নীচের জল দেখা যাচ্ছে। জায়গাটাকে চিনতে পারল সে। ওইখানেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, আর ঘোড়াটা চিৎকার করছিল। সুধাময় বললেন, "আমি যা করছি, তুমি তাই করবে।"

তারপর একটা পাথরের আড়াল থেকে বিচিত্র ধরনের মোটা দড়ি বের করে নীচে ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ন দেখল, সুধাময় সেই দড়ি ধরে খাঁজে-খাঁজে পা রেখে নীচে নেমে যাচ্ছেন। এত অভ্যস্ত উনি যে মনে হচ্ছে দোতলা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামছেন। সায়নের খুব ভয় করছিল। সে দড়ি বেয়ে কখনও নামা-ওঠা করে নি। যদি হাত পিছলে যায়, তা হলে আর দেখতে হবে না। নীচে নামার কি অন্য কোনোও পথ নেই! আছে। যেদিকে যাওয়ার ব্যাপারে তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে, সেদিকে গেলে এইসব কসরত মোটেই করতে হতো না।

নীচে নেমে সুধাময় ইঙ্গিত করলেন, হাত নেড়ে তাকে নেমে আসতে। সায়ন হাত বাড়িয়ে দড়িটাকে ধরল। বেশ শক্ত। এইরকম দড়ি সে কখনও ছাখে নি। সুধাময় এটাকে কোত্থেকে পেয়েছেন কে জানে! সন্তর্পণে দড়ি ধরে খাঁজে পা রাখল সায়ন। তার হাতের তেলো এখন ঘামতে শুরু করেছে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে পা রাখার খাঁজ করা আছে। বোধহয় সুধাময় করেছেন। নীচের দিকে তাকাতে ভয় করছিল তার। দড়িটা খুব দুলছে। আর সেই দোলার সময় খাঁজ থেকে যেই পা সরে যাচ্ছে, অমনি মনে হচ্ছে হাত পিছলে গেল বলে। নিশ্বাস বন্ধ করে নামছিল সায়ন। এই সময় তার পাশ দিয়ে সুড়ুত করে কিছু একটা নেমে যেতেই সে এমন চমকে উঠেছিল যে, দড়িতে হাতটা অনেকখানি পিছলে নেমে গেল। কোনোও রকমে সেটাকে আঁকড়ে ধরে সে দুবার দোল খাওয়ার পর আবার পা রাখার খাঁজ খুঁজে পেল। বালিতে নামবার পর কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল সায়নের নিজেকে ফিরে পেতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। সুধাময় ওর কাঁধে হাত রাখলেন, "খুব ভালো। কয়েকবার নামলে তুমি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ওঠার সময় হাতের ওপর বেশি জোর পড়বে। প্রতিটি খাঁজে পা রেখে শরীরটাকে টেনে টেনে তুলতে হবে। তবে তোমার শরীর তো হালকা, কোনোও অসুবিধে হবে না।" সুধাময় দড়ির প্রান্তটা ধরে চেষ্টা করলেন এমনভাবে পাহাড়ের গায়ে চেপে রাখতে, যাতে চট করে

বোঝা না যায় ওটা ওখানে আছে। তারপর বললেন, "এসো, ঠিক আমার পেছন-পেছন।"
চারধারে থমথমে জঙ্গল। শুধু নদীর মতো মনে হয়েছিল যে গভীর ঝরনা, সেটি চুপচাপ বয়ে যাচ্ছে এখানে। কিন্তু জলের শব্দ হচ্ছে নীচে। বোধ-হয় জলস্রোত ওখানে বাধা পাচ্ছে কিছুতে। সুধাময় নদীর ধার দিয়ে হাঁটছিলেন। এখনও জঙ্গলে সকালের আমেজ। ওদের আগে-আগে ইন্দ্র যাচ্ছিল গম্ভীর মেজাজে। পায়ের তলায় অসমান জমি, বুনোঘাস। বাঁ দিকে পাহাড়, ডান দিকে নদী। এখনও রোদ নামে নি নদীতে। দু'পাশের গাছগাছালি চুঁইয়ে আলো ঢোকার সময় হয় নি এখনও।
নদীর গায়ে একটা খাঁড়িমতো জায়গায় এসে দাঁড়ালেন সুধাময়। সায়ন দেখল, অদ্ভুত ধরনের একটা নৌকো ঢোকানো রয়েছে সেখানে। সুধাময় বললেন, "কিছুদিন আগেও আমি এটায় করে যাতায়াত করতাম। কিন্তু এখন নদীতে এমন একটা প্রাণী এসেছে, যার কাছে এটা ডুবিয়ে দেওয়া কিছুই না।" চকিতে মনে পড়ল সায়নের, ঘোড়াটা কী ভয়ই না পেয়ে-ছিল! সে জিজ্ঞেস করল, "কুমির?"
"না। কুমির এখানে আসবে কোত্থেকে? আমি ওর নাম জানি না। তবে জল ছেড়ে ওপরে কখনও ওঠে না, এই রক্ষে।" সুধাময় এবার নদীর ধার ছেড়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সায়নের মনে হলো তার পায়ে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। কিন্তু সে মুখে কিছু বলল না। ওটা এখনও তেমন অসুবিধে করছে না। এদিকের জঙ্গলটা আরও গভীর। গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটা মুশকিল। সুধাময় সন্তর্পণে ডালপালা সরিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দু'বার শরীর থেকে জোঁক ফেলল সায়ন। গাছের পাতা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে গায়ে উঠে আসে ওরা। চা-বাগানে সে জোঁক অনেক দেখেছে। এখন আর মোটেই ভয় লাগে না।
নদীর ধারে এই জায়গাটা বেশ সমতল। তবে গাছগাছালির ফাঁকে লতা-গুল্ম ছেয়ে আছে। হঠাৎ ইন্দ্র ছুটে গেল এ-গাছ ধরে ও-গাছ ছুঁয়ে

সামনের দিকে। সুধাময় হাসলেন, "আবার একটা পাওয়া গিয়েছে।" ততক্ষণে নজরে এসেছে সায়নের। লতাগুল্মের মধ্যে একজোড়া শিং দেখা যাচ্ছে। মানুষের গন্ধ পেয়েই বোধহয় শিং দুটো খুব নড়াচড়া করছে। কাছাকাছি পৌঁছে সায়ন দেখতে পেল মাঝারি সাইজের একটা হরিণ তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে লাফাতে গেল, কিন্তু গর্তটা তার পক্ষে এত উঁচু যে, ধাক্কা খেয়ে সেখানেই ফিরে পড়ল।

সুধাময় বললেন, "এই একটা হরিণ পেলে শীতকালে আমার দিনদশেক দিব্যি চলে যায়। গরমকালে মাংস বেশিদিন রাখা যায় না। তবে এই হরিণটাকে বোধহয় আমাদের ভোজে লাগানো যাবে না।"

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "এটা এখানে পড়ল কী করে?"

"গতকাল আমি ফাঁদটা পেতে গিয়েছিলাম। ন' মাসে ছ' মাসে এক আধবার এই ফাঁদটায় হরিণ কিংবা শুয়োর পড়ে। তোমার কপালেই এটাকে ধরা গেল!"

"এত সুন্দর হরিণটাকে মেরে ফেলবেন?"

সুধাময় কঠোর চোখে এইবার সায়নকে লক্ষ্য করলেন, "জঙ্গলের নিয়ম হলো একজনের প্রাণের বিনিময়ে আর একজনকে বেঁচে থাকতে হবে। যার যত বুদ্ধি এবং শক্তি আছে, সে ততদিন জীবিত থাকবে। তোমরা যখন শহরে মাছ কিংবা মাংস খাও তখন তো তার একটা যুক্তি থাকে, তাই না? অবশ্য এই হরিণটাকে দান করতে হবে আমাকে।"

"কাকে দান করবেন?"

"দেখতেই পাবে।" সুধাময় একটা শক্ত ধরনের লতা ভোজালির কোপে কেটে নিলেন, সামনের গাছ থেকে। তারপর বললেন, "তুমি শিংটাকে ধরো। খুব ছটফট করবে, কিন্তু ওরা সাধারণত খুব ভিতু প্রকৃতির হয়। এই লতা হাতিও ছিঁড়তে পারবে না সহজে।"

সায়ন খপ করে হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে শিং দুটোকে ধরতেই প্রাণীটা একটা ঝটকা দিল। কোনোও রকমে টাল সামলেও সেটাকে হাতছাড়া

করল না সায়ন। যেহেতু গর্তে বেশি জায়গা নেই, তাই হরিণটা খুব জোর খাটাতেও পারছে না। এই সময় সুধাময় লতাটা শক্ত করে হরিণের শিং-জোড়ায় এমন করে বেঁধে দিলেন যে কেটে না ফেললে খোলা সম্ভব নয়। লতার অন্য প্রান্ত একটা ডালে বাঁধলেন সুধাময়। তারপর দু'হাত দিয়ে হরিণটাকে টানতে লাগলেন ওপরে। মানুষটার শরীরে শক্তি আছে, যতই বয়স হোক না কেন। সায়নও ওঁর সঙ্গে হাত লাগাল। প্রায় মিনিট আটেক ধস্তাধস্তি করার পর হরিণটাকে ওপরে তোলা গেল। ওপরে উঠেই হরিণটা তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে লতার টানে হোঁচট খেয়ে পড়ল। সুধাময় তখন হাঁফাচ্ছিলেন। একটু সময় নিয়ে তিনি বললেন, "হরিণটা কিছুক্ষণ লাফিয়ে কাহিল হোক, তারপর টেনে নিয়ে গ্রামে যাওয়া যাবে।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পর সায়নের জঙ্গলটা সড়গড় হয়ে গেল। প্রত্যেকটা জঙ্গলের যেমন আলাদা চরিত্র থাকে তেমনি যারা সেখানে বাস করে, তারা সেই চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। সুধাময় সেনের অভ্যস্ত পদ-ক্ষেপের সঙ্গে তাল রেখে যাচ্ছিল সায়ন। ইন্দ্রের কথা আলাদা। সে যাচ্ছে আগে আগে, অনেকটা গাইডের মতো। যেতে চাইছে না হরিণটা। হঠাৎ স্বাধীন জীবন থেকে সরে এসে মানুষের সঙ্গে হেঁটে যাওয়া তার একদম পছন্দ হচ্ছে না। প্রায়ই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ছে সে অবাধ্য ছাগলের মতো, কিংবা কোনোও বুনো ডালের মধ্যে মুখ গুঁজে প্রতিবাদের রাস্তা খুঁজছে।

সুধাময় বললেন, "এই জঙ্গলে শুধু সিংহ বাদে বোধহয় সব জন্তুই আছে। যখন চলবে তখন চোখ তো খোলা রাখবেই, মনটাকেও সতর্ক রাখতে হবে। এখন আমরা দলবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। হয়তো কেউ ইচ্ছে হলেও সামনে আসছে না, তবে সে যে নিঃশব্দে আমাদের লক্ষ্য করে যাচ্ছে না তাই বা কে বলবে! কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছ?"

সায়ন কোনোও মিষ্টি গন্ধ পেল না। বরং জঙ্গলের শরীর থেকে একটা তীব্র গন্ধ বের হচ্ছে। সুধাময় কোথায় যাচ্ছেন সে জানে না। কিন্তু এখন তার হাঁটতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। পায়ের ফোলা কমেছে বটে, কিন্তু বেশ টনটন করছে এখন। খসখস শব্দ হলো। সায়ন দেখল একটা মেটে-রঙা খরগোশ ছুটে এসে তার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। বেচারা যেন কী করবে ভেবে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে। হাত বাড়ালেই তোলা যেত ওটাকে, কিন্তু এই সময় হরিণটা আবার অবাধ্য হয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে পড়তেই খরগোশটা চম্পট দিল। মাথার ওপর অজস্র পাখি চিৎকার করছে। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব মজা লাগছিল সায়নের। এই জঙ্গলে ইন্দ্রর জাতভাই আছে প্রচুর। তারা গাছের ডালে-ডালে শব্দ করছে উৎকটভাবে। ইন্দ্র সেদিকে লক্ষ্য করছে না। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বুনো অশিক্ষিত স্বজাতিদের সে পাত্তা দিতে নারাজ। বরং এই জঙ্গলটা যত তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাওয়া যায়, ততই তার পক্ষে মঙ্গল।

পথ নেই, কিন্তু করে নেওয়া এই পথ যেন শেষ হতেই চাইছিল না। জঙ্গল এত ঘন যে, মাথার ওপর আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। এখন কত বেলা তাও বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ সুধাময় সেন বললেন, "নিশ্চয়ই তোমার খিদে পেয়েছে। এসো খাওয়া যাক।" হরিণ বেঁধে-রাখা লতার প্রান্তটা একটা গাছে ফাঁস দিয়ে সুধাময় বাঁ দিকের জঙ্গল সরিয়ে ইন্দ্রকে অনুসরণ করে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই সায়ন দেখতে পেল বেশ কয়েকটা মোটাসোটা কলার কাঁদি পেকে হলুদ হয়ে আছে। অবশ্য বেশির ভাগ কলার কাঁদি এখন শূন্য। সুধাময় ভোজালি দিয়ে একটা ছড়া সুন্দর করে কেটে চলে এলেন কাছে। বললেন, "মর্তমান কলা। দারুণ খেতে। এই জঙ্গলে বস্তুটি এত বেশি যে, ইন্দ্রের বন্ধুরা তাড়াহুড়ো করে খায় না। যতক্ষণ না ভালো পাকে ততক্ষণ ওরা হাত দেয় না। আমরা ভাগ বসালাম বলে ওরা ছ্যাখো মুখ ভ্যাংচাচ্ছে?"

এই সময় সুধাময় সেনকে একদম ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। এই মানুষটি যে এককালে স্বাধীনতাসংগ্রামী ছিলেন, নেতাজীর সঙ্গে দিল্লি চলো বলে ব্রিটিশদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা কে বলবে! মানুষটার জন্যে ওর হঠাৎ কেমন কষ্ট হচ্ছিল।

জঙ্গল শেষ হলো। শেষ না বলে বলা যায় ওরা ছেড়ে চলে এলো। এখন পাথুরে মাটির পাহাড়। সুধাময়ের চলার সঙ্গে হরিণটা যেন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। প্রথমে ইন্দ্র, সুধাময় হরিণ টেনে চলেছেন, তারপর সায়ন। বেশ খাড়াই না হলেও উঠতে হচ্ছে ওদের। দু'পাশে ন্যাড়া পাহাড়, মাঝখানে সরু পথ। সুধামযকে অনুসরণ করে যাচ্ছে সে। ক্রমশ জঙ্গলটা পেছনে পড়ে গেল। পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল পৃথিবীটা। কিন্তু কানে জলের শব্দ আসছে। বোধহয় ঝরনা আছে কাছেপিঠে। এখন ওরা আকাশ-ছোঁওয়া দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে চলেছে। এবং তখনই কানে শব্দ ভেসে এলো। কেউ যেন বাজনা বাজাচ্ছে। ডুম ডুম ডুমাং। ঠিক একই তালে তালে। সায়ন একটু সুধাময়ের দিকে তাকাল। তিনি নির্লিপ্ত মুখে হাঁটছেন।

হঠাৎ আড়াল সরে গেল সামনে থেকে। সায়ন দেখল সুধাময় দাঁড়িয়ে ইশারায় তাকে থামতে বলছেন। সায়ন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর ধীরে-ধীরে সুধাময়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল।

পাহাড়ের বেশ কিছুটা ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তারা। অনেকটা ব্যালকনির মতো। সামনে ঢালু হয়ে গেছে কিছুটা জায়গা, তারপর কিছুটা সমতল। আর সেখানেই তাজ্জব ব্যাপারটা ঘটছে। বিচিত্র পোশাক-পরা মানুষের মেলা বসেছে ওখানে। কোথাও দল বেঁধে নাচ-গান চলছে, কোথাও বাজনা বাজাচ্ছে কয়েকজন। এপাশে তীর ছুঁড়ছে কেউ-কেউ। ওটা প্রতি-যোগিতার খেলা বোঝা যাচ্ছে। মেলায় যারা যোগ দিয়েছে তাদের সংখ্যা কখনও একশোর বেশি নয়। পুরুষরা বিচিত্র পোশাক পরেছে। সারা গায়ে নানান নকশা আঁকা। মেয়েরাও পরেছে ঘাগরার মতো অদ্ভুত

পোশাক। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। এত ছোট যে মুখটাকেই অসুন্দর করে তুলেছে। পুরুষদের বেশির ভাগই ন্যাড়া। শুধু দু'জনের মাথায় লম্বা বেণী দেখতে পেল সায়ন। এইরকমের মানুষ সে কখনও দ্যাখে নি। মুখচোখের গড়নে পাহাড়ের মানুষের আদল স্পষ্ট। কিন্তু এই মানুষেরা চা-বাগানের দিকে কখনও যায় না।

সুধাময়ের গলা শুনে চমকে উঠল সায়ন। খুব শীতল এবং কেটে কেটে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি, "আজ ওদের উৎসবের দিন। আমরা ওখানে যাব। তোমার ভাষা ওরা বুঝবে না। তাই অনাবশ্যক কৌতূহল দেখিও না।"

"কারা ওরা?" সায়ন জিজ্ঞেস না করে পারল না।

"এক ধরনের পাহাড়ি উপজাতি। ওরা এখনও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নি। সভ্য পৃথিবীর কোনোও তাত্ত্বিক এখনও ওদের আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু ওরা বেঁচে আছে নিজেদের সভ্যতা নিয়ে। এমনিতে আর-পাঁচটা পাহাড়ি মানুষের মতো। ওরা সরল, কিন্তু প্রতারিত হলে খুন করতে দ্বিধা করে না। ওদের প্রথা যারা অমান্য করবে, তাদের জন্যে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা জানলে চমকে উঠবে। ওরা অন্যায়কারীকে কখনও দয়া করে না।" নীচের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন সুধাময়।

"আপনি ওদের ভাষা বুঝতে পারেন?"

"পারি। শোনো, আমাদের এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। ওরা পছন্দ করে না কেউ ওদের লুকিয়ে দেখুক। অবশ্য এখানে মানুষের অস্তিত্বই নেই। আর হ্যাঁ, আমি যতক্ষণ না চাইছি ততক্ষণ তুমি আমার খোঁজ কোরো না।"

"মানে? আমরা কি একসঙ্গে থাকব না?"

"তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। সবসময় তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগবে কেন? তা ছাড়া আমার কিছু জরুরি কাজ আছে। যখন সময় হবে আমিই তোমাকে ডেকে নেব। চলো, এগিয়ে যাওয়া

যাক।” সরে এলেন সুধাময়। তারপর হরিণটাকে টানতে-টানতে এগিয়ে চললেন ডান পাশে। ইন্দ্র এবার তড়াক করে সুধাময়ের শরীর বেয়ে উঠে তাঁর কাঁধে গিয়ে বসল। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছিল এখন কী করতে হবে সেটা সে জানে। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা একটা পাহাড়ের নীচে চলে এলো। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। ঝিরঝিরে জল পায়ের তলায়। যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই ঢালু পথ বেয়ে স্বচ্ছন্দে না নেমে কেন এইরকম বিদ্‌ঘুটে পথে আসা হলো সেটা বুঝতে পারছিল না সায়ন। ক্রমশ ওরা একটা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। এবং সেখানে পৌঁছে সুধাময় সেন চিৎকার করে কিছু বললেন। ভাষাটা বোধগম্য হলো না সায়নের। ইংরেজি বাংলা হিন্দি মদেশিয়া এমন কী নেপালি পর্যন্ত যে নয় তাতে সে নিশ্চিত। তিনবার চিৎকার করার পর গুহার ওপাশে আলো ফুটল। যেন কোনোও আড়াল সরিয়ে দিল কেউ। সুধাময় সেন হরিণটাকে টানতে টানতে এগিয়ে চললেন সামনে। সায়ন তাঁকে অনুসরণ করল। তার মনে পড়ছিল সেই চিচিংফাঁক-চিচিং বন্ধ গল্পটির কথা। সেইরকম ব্যাপার নাকি!

তারপরেই তারা আলোয় এসে দাঁড়াল। এবং তখনই সায়ন দেখতে পেল গুহামুখে বিশাল পাথর বিশেষ কায়দায় রাখা আছে। পাথরটা দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি কোণের ওপর যা এপাশ থেকে সামান্য চাপেই দিক পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু গুহার ওপাশ থেকে হাজার ঠেললেও একে সরানো যাবে না। ঢোকামাত্র দু'জন পুরুষ সুধাময়ের দিকে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানাল। তার পরেই লুব্ধ চোখে ওরা হরিণটার দিকে তাকাতে লাগল। সুধাময় সেন একটা হাত মাথার ওপর তুলে বিচিত্র কিছু শব্দ উচ্চারণ করতেই লোক দুটোর মুখে হাসি ফুটল। সায়নের মনে হলো, এখন যে মানুষটি হরিণ-হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সে চেনে না। এবার লোক দুটো সায়নের দিকে তাকাল। পলকেই চোখ ছোট হলো, কপালে ভাঁজ পড়ল। ওর দিকে হাত তুলে তারা বিদ্‌ঘুটে কিছু শব্দ উচ্চারণ

করতেই সুধাময় মাথা নাড়লেন, কয়েক সেকেণ্ড অনর্গল কিছু বলে গেলেন, শেষ পর্যন্ত সায়নের কাঁধে হাত রেখে কথা শেষ করলেন। সায়ন বুঝতে পারল, তার প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছে। নিশ্চয়ই ওরা তার পরিচয় জানতে চাইছে। এবং সুধাময় কিছু একটা বুঝিয়ে ওদের শান্ত করলেন, কারণ লোক দুটোর কপালের ভাঁজ মিলিয়ে গেল। হরিণটার গায়ে হাত বুলিয়ে ওরা পাথরটার দিকে এগিয়ে গেল। এবার সুধাময় নিচু গলায় বললেন, "ওরা তোমার এখানে আসা বোধহয় পছন্দ করছে না। অবশ্য না করা অস্বাভাবিক নয়। তুমি যখনই ওদের মুখোমুখি হবে তখনই হাসবে। প্রশ্ন করলে হেসে ইঙ্গিতে বোঝাবে যে, ওদের ভাষা তুমি বুঝতে পারছ না। বুঝতে পারছ ?"

সায়ন দ্রুত মাথা নাড়ল। সে এই মানুষগুলোকে দেখে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। নিজের অজান্তেই সে হাসবার চেষ্টা করল। ওরা আরও একটু এগিয়ে যাওয়ামাত্র আচমকা সমস্ত শব্দ এবং সঙ্গীত থেমে গেল। যেন একটা উদ্দাম কার্নিভাল আচমকা পাথর হয়ে কয়েক পলক স্থির রইল। তারপর কয়েকটি মেয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে হাসতে হাসতে ছুটে এলো ওদের দিকে। কাছাকাছি হয়ে ওরা ঝরনার মতো কিছু শব্দ ছুঁড়ে দিল সুধাময়ের দিকে। তিনি এক হাত ওপরে তুলে সেই আগের বারের মতো শব্দ উচ্চারণ করতে মেয়েরা খুশি হলো। তারা হাসতে হাসতে সবাই মিলে হরিণটাকে জড়িয়ে ধরল। আচমকা আক্রান্ত হয়ে বেচারা ছটফট করছে। তখনও লতার প্রান্ত সুধাময়ের হাতে ধরা। তিনি সেটা একটি মেয়ের হাতে তুলে দিতেই তারা খুব খুশি হলো। সুধাময় দু'হাত নেড়ে কিছু বুঝিয়ে দিলে মেয়েরা চিৎকার করে দলের অন্যান্যদের সেই খবরটা দিতে লাগল। সুধাময় ততক্ষণে এগিয়ে গিয়েছেন সামনে। সায়ন এবার লক্ষ্য করল, একজন বিশাল চেহারার বৃদ্ধ বসে আছেন কাঠের আসনে। তাঁর দু'পাশে প্রহরীর মতো কয়েকজন দাঁড়িয়ে। চোখ ফেলতেই বোঝা যাচ্ছে ইনি এখানকার কর্তাব্যক্তিদের একজন। সুধাময় তাঁর সামনে গিয়ে

একটা হাত মাথার ওপর তুলতে বৃদ্ধও সেই একই রকম ভঙ্গি করলেন। যদিও সায়ন বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু পাশে থাকলেও মোটেই বুঝতে পারত না ওঁরা কী কথা বলছেন। অনর্গল শব্দের বন্যা বয়ে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হলো যেন। সুধাময় চিৎকার করে ডাকলেন, "এদিকে এসো।" সায়ন দ্রুত এগিয়ে যেতেই সুধাময় কড়া গলায় বলে উঠলেন, "তোমাকে বলেছি মুখে হাসি রাখতে। হাসি না থাকলে তুমি যে বিপদে পড়বে তা থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব না। হাসি-হাসি মুখ করে এসো।"

চেষ্টা করে হাসা যে কী কষ্টকর তা এই মুহূর্তে বোঝা গেল। সুকুমার রায়ের কবিতা পড়লেই যেমন ঠোঁটে হাসি এসে যায়, সেরকম একটা কিছু না হলে··· সায়ন প্রাণপণে হাসবার চেষ্টা করল। বৃদ্ধ মানুষটি স্বাস্থ্যবান, তাঁর ভুঁড়িটিও দেখবার মতন। বোঁচা নাক মুখের মধ্যে বসে গেছে। চোখ এত ছোট যে, মাংসের আড়ালে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। মাথার চুল বেণী করে পেছনে ঝোলানো। উন্মুক্ত বুকে কয়েকটা চিহ্ন আঁকা সাদা লাল এবং হলুদ রঙে। এই চিহ্নগুলো দেখে চমকে উঠল সায়ন। চিহ্নগুলো সে যেন কোথায় দেখেছে। কোথায়? এবং তখনই তার মনে পড়ল বুধুয়া-বুড়োর কথা। ওদের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভুটানের পাহাড়ে রাত্রে যে আগুনচিহ্ন দেখা গিয়েছিল এবং যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল তার সঙ্গে এর কোনোও প্রভেদ নেই। বুধুয়া-বুড়ো চিহ্নগুলোর ব্যাখ্যা করে বলেছিল এগুলো শয়তানের নির্দেশ। এই বৃদ্ধের বুকে সেই নির্দেশ কেন লেখা থাকছে তা বোধগম্য হলো না সায়নের। ঠিক সেই সময় যেন আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ল। চিৎকারটা এমন জোরালো এবং আচমকা যে সায়নের গলা শুকিয়ে এলো। সে দেখল বৃদ্ধ তার দিকে খুব রাগী ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন। সায়নের দুটো পা কাঁপতে লাগল। সে বুঝতে পারছিল আশপাশের সমস্ত মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। এবং সেই মুহূর্তে সুধাময় সেনের উপদেশ মনে পড়ল তার। সব সময় তাকে হাসতে হবে।

অনেক কষ্টে সে ঠোঁট দুটো বিস্ফারিত করার চেষ্টা করল। সেদিকে নজর পড়ল বৃদ্ধের। সায়ন প্রাণপণে ঠোঁট টানছে। ভূতের রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বাঘা কী করছিল মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই হাসি আসছে না। আর ঠিক তখনই হঠাৎ তার পেটের ভেতর হাসি কিলবিলিয়ে উঠল। বৃদ্ধের লম্বা সাদা-কালোয় মেশা বেণীর ডগায় উড়ে এসে বসেছে একটা গঙ্গাফড়িং। মনে হচ্ছে বেণীর ডগায় কেউ যেন বো-টাই বেঁধে দিয়েছে যত্ন করে। দৃশ্যটা হাসি ডেকে আনল চটপট। বেণীটা দুলছে, গঙ্গাফড়িংটাও।

এবার যেন বোমা ফাটল। চমকে উঠেও হাসিটাকে ধরে রাখল সায়ন। বৃদ্ধ হাসছেন। প্রচণ্ড শব্দে এবং দ্রুত মাথা নাড়তে-নাড়তে হেসে যাচ্ছেন। চাপা গলায় সুধাময় সেন বললেন, "খুব জোর বেঁচে গেলে।"

হাসি শেষ করে বৃদ্ধ একটা হাত ওপরে তুলে কিছু বললেন। সায়ন কী করবে বুঝতে না পেরে তেমনি হাসি-হাসি মুখ করে রইল। হাসতে-হাসতে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন আসন ছেড়ে। তারপর দুটো ভারী হাত সায়নের কাঁধে রেখে শরীরটাকে নাড়ালেন। হাতের কবজি দুটো কী মোটা-মোটা, লক্ষ্য করল সায়ন। সে তখনও ঠোঁট ছড়িয়ে রেখেছে। নিজেকে খুব বোকা-বোকা লাগছে। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে বৃদ্ধ ফিরে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সায়ন।

এখন তার দিকে ওরা নজর দিচ্ছে না। সায়ন দেখল বৃদ্ধের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেশ রোগামতন আর এক মাঝবয়সী, যার চুল বৃদ্ধের মতো লম্বা বেণীতে বাঁধা। এই দু'জন ছাড়া এখানকার কোনোও পুরুষের মাথায় চুল নেই। এত ন্যাড়া মানুষ সে কখনও একসঙ্গে ছাখেনি। রোগা মানুষটি যেন একটু রাগত ভঙ্গিতেই সুধাময় সেনকে কিছু বলছে। আর তাকে থামাবার চেষ্টা করছেন বৃদ্ধ। রোগা লোকটার সমস্ত শরীরে বিচিত্র রঙ করা। সেগুলো নকশাও হতে পারে। হাতে একটা মানুষের হাতের মতো হাড়। লোকটি খুব রাগী নিশ্চয়ই।

চারপাশে আবার উৎসবের আবহাওয়া ফিরে এসেছে। গান হচ্ছে, বাজনা বাজছে। মেয়েরা হাসতে-হাসতে নাচছে। একটা ইংরেজি ছবিতে সে মধ্যযুগে কোনোও গ্রামের কার্নিভাল দৃশ্য দেখেছিল। সায়নের মনে পড়ল সেই দৃশ্যটার কথা। তফাত শুধু, ছবির পুরুষ-মহিলারা বেশ সেজেগুজে ছিল। ঠিক এইসময় দূরে কোথাও একটা যান্ত্রিক শব্দ উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে হৈচৈ পড়ে গেল। চারপাশের মানুষজন চকিতে আড়ালে চলে গেল। সায়ন আবিষ্কার করল তার সামনে কেউ নেই। এই সময় সুধাময় তাকে টেনে একটা বড় পাথরের আড়ালে নিয়ে এলেন। অনেক ওপরে একটা এরোপ্লেন অলস ভঙ্গিতে উড়ে চলে গেল। সেটা চোখের আড়ালে মিলিয়ে যেতে সবাই যেমন মজা করছিল তেমন করতে লাগল।

সুধাময় সেন বললেন, "এদের কথা বোঝার চেষ্টা করো। এখানে যখন থাকতে হবে, তখন ভাষাটা শেখা দরকার।" এই বলে তিনি মানুষের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন।

এখানে থাকতে হবে মানে? সায়ন চমকে উঠল। তাকে এই পাহাড়িদের গ্রামে সারাজীবন থাকতে হবে নাকি? তার বুকে কান্নাটা চল্‌কে উঠল। উঠল। ইশ, ওই এরোপ্লেনের পাইলট যদি তাকে দেখতে পেত? ও কি বাগডোগরায় যাচ্ছে? ঠিক এইসময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। শিক্ষিত ঘোড়াগুলো মেপে-মেপে পা ফেলছে যেন। ঠিক তখনই দূরে একটা পাথ-রের ফাঁকে ঘোড়া এবং তার সওয়ারকে দেখতে পেল সায়ন। সওয়ারের পরনে কালো পোশাক, মাথা ন্যাড়া।

সায়ন চমকে উঠল।

এখন আবার চারপাশে উৎসবের মেজাজ। নাচ-গান চলছে উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কে বলবে, একটু আগে এরাই ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েছিল পাথরের খাঁজে-খাঁজে। অলস ভঙ্গিতে মেয়েরা হাঁটা চলা করছে। বিচিত্র সব ফল এবং হাতে তৈরি জিনিসপত্র সাজিয়ে বসেছে কিছু বৃদ্ধ

বৃদ্ধা। যেন ম্যাজিকের মতো পালটে গেল পরিবেশটা। কিন্তু সায়নের দৃষ্টি ছিল ওপাশে। একটার পর একটা কালো ঘোড়া এসে জড়ো হলো ওপাশের বিশাল পাথরের আড়ালে। প্রতিটি সওয়ারের মাথা ন্যাড়া। মুখে পাথরের নিস্পৃহতা। দেখলেই মনে হয় দয়ামায়া স্নেহ ব্যাপারগুলোর সঙ্গে এদের কোনোও সংশ্রব নেই। এবং এই মানুষগুলোর সঙ্গে উপত্যকায় উৎসবমুখর মানুষদের কোনোও মিল নেই। না পোশাকে, না মুখের অভি-ব্যক্তিতে। হয়তো খুঁটিয়ে দেখলে মুখের গড়নে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং ওই পর্যন্ত। কিন্তু টাকগুলোর দিকে তাকালে একটা শীতলবোধ মনে জন্ম নেয়।

সায়ন স্পষ্ট মনে করতে পারল, এদেরই সে দেখেছে তাদের চা-বাগানের গা-ঘেঁষা নদীর শুকনো বুকে। এরাই সুধাময় সেনের ঘোড়াটাকে খুঁজছিল। না পেয়ে চলে গিয়েছিল ভুটানের পাহাড়ে। এই পাহাড়ি গ্রামে এরা এলো কেন? এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেও কেউ কিছু বলছে না তো! বিদেশী নয় ওরা, তাহলে এরা ভয় পেত অবশ্যই। সায়ন একটি মাথা-উঁচু পাথরের আড়ালে শরীরটা লুকিয়ে রাখল। তার কেবলই মনে হতে লাগল ওই ন্যাড়া-মাথা লোকগুলো ভালো নয়। ওদের সামনে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং আড়ালে থেকে ওদের লক্ষ্য করাই ভালো। ওর চকিতে সুধাময় সেনের কথা মনে পড়ল। তাঁকে ন্যাড়া মাথাগুলো সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া উচিত। কিন্তু মুখ তুলে নানান মানুষের ভিড়ে সে সুধাময়কে খুঁজে পেল না। অথচ এই পাথরের আড়াল ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতে সাহস হচ্ছিল না তার। মনে মনে ছটফট করতে লাগল সায়ন। সুধাময় সেন মানুষটা ভালো। তাকে আশ্রয় দিয়েছেন, যত্ন করেছেন। তিনি যদি বিপদে পড়েন তাহলে সে কোথায় দাঁড়াবে? এই গহন জঙ্গলে, অচেনা পাহাড়ে ওই মানুষটি ছাড়া তার আর দ্বিতীয় কোনোও আশ্রয় নেই। অথচ তিনি এখন কোথায় আছেন তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

সায়নের মনে অন্য একটি মতলব এলো। ওই লোকগুলো কে, তা সে জানে

না। কিন্তু একথা ঠিক, ওরা চা-বাগানের পথটা চেনে। সেদিন ওদের চলা-ফেরা দেখে বোঝা গিয়েছিল, ওই পথ ওদের মোটেই অচেনা নয়। ওরা যদি ইচ্ছে করে, তা হলে সায়নকে পৌঁছে দিতে পারে চা-বাগানে। এই একটিমাত্র উপায় তার সামনে খোলা। যদি ওদের সঙ্গে ভাব জমানো যায়, তা হলে সে কোনোও রকমে বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু লোক-গুলোর কাছে যেতে মোটেই সাহস পাচ্ছে না সে। ওরা কি এদের মতো বাংলা হিন্দী বা ইংরেজি বোঝে না? এইসব চিন্তায় এতটা মশগুল ছিল সায়ন, যে, টের পায় নি ওই পাথরের আড়ালে সে একা দাঁড়িয়ে নেই। অন্যমনস্কভাবে ডানদিকে পা ফেলতেই অস্ফুট একটা শব্দ উঠল। যেন কেউ আচমকা ব্যথা পেয়ে সামান্য কাতরে উঠল। চমকে মুখ ফেরাতেই অবাক হয়ে গেল সায়ন। ঠিক তার পেছনেই লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এক বৃদ্ধা। সে ওর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছিল না দেখে। অত্যন্ত লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে সায়ন বলল, "আমি দেখি নি, অন্যায় হয়ে গেছে।"

বৃদ্ধার মুখে তখনও যন্ত্রণার ভাঁজ। চোখ বন্ধ করে দাঁত কামড়ে বোধহয় ব্যথা সামলে নিচ্ছিল। সায়নের কথায় কোনোও প্রতিক্রিয়া হলো না। সায়ন আবার ঠোঁট খুলতে গিয়েই সামলে নিল। কথা বলে কোনোও লাভ হবে না। বৃদ্ধা কিছুই বুঝতে পারবে না। সে উবু হয়ে বসে বৃদ্ধার চামড়া-ফাটা পায়ে হাত দিল। এবং তখনই টের পেলো ওর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। এখানে এইভাবে বৃদ্ধা কেন শুয়ে আছে সেটা বোধগম্য হলো। অন্য সময় হলে কিংবা চা-বাগানে এইরকম নোংরা হয়ে থাকা বৃদ্ধার শরীরে হাত দিতে মোটেই ইচ্ছে করত না। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে। কিন্তু নিজের অন্যায় এবং বৃদ্ধার অসুস্থতা তাকে সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করল। বৃদ্ধা এবার খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। কাতর চোখে দেখছে সায়নকে। কিছুক্ষণ আদর করার ভঙ্গিতে হাত বুলিয়ে সায়ন আবিষ্কার করল বৃদ্ধার দুই চোখের কোলে জল টলটল করছে। এমনটা বোধহয় আশা করে নি। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে উঠে বসল। সায়ন বুঝল

অত্যন্ত অযত্নে থাকে ওই রমণী। তার দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে যে কথাগুলো বলল সেটা বোঝা অসম্ভব সায়নের পক্ষে। ইঙ্গিতে হাত নেড়ে সায়ন বোঝাল সে কথাগুলো বুঝতে পারছে না। এবার হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। এই সময় একটা চিৎকার উঠল পাহাড় কাঁপিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের সমস্ত হৈচৈ আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর সেই নিস্তব্ধ উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র মানুষগুলো জড়ো হতে লাগল সেই জায়গায়, যেখানে সুধাময়ের সঙ্গে সায়ন প্রথম দেখা করেছিল নেতার সঙ্গে। সায়নের খুব ইচ্ছে করছিল লোকগুলোর সঙ্গে এগিয়ে যেতে। কিন্তু ওরা যেভাবে নিঃশব্দে হাঁটছে তাতে মনে হলো এখনই একটা কাণ্ড ঘটবে এবং তার যাওয়াটা ঠিক হবে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা আর একটু দেখতে চাইছিল, কিন্তু বৃদ্ধা তার হাত ধরে টান দিল। অবাক হয়ে তাকাতেই বৃদ্ধা ইশারা করল উঠে না দাঁড়াতে। তারপর আঙুল ঠোঁটে চেপে নিষেধ করল কথা না বলার জন্যে। এবং তারপরেই উপত্যকা জুড়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ধ্বনিত হতে লাগল নিজেকে পাথরের আড়ালে যতটা সম্ভব গুটিয়ে রেখে সায়ন দেখল সেইসব কালো ঘোড়া আর তাদের ন্যাড়া মাথা সওয়াররা ছুটে বেড়াচ্ছে চার-পাশে। তারা যেন দেখে নিচ্ছে আর কেউ দূরে থেকে গেল কি না। একটা ঘোড়া হাতপাঁচেক দূর দিয়ে ছুটে যেতেই বুকটা ধক করে উঠল সায়নের। যদি দেখতে পেত তা হলে! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো দেখলে কীই বা হতো! সে যে সুধাময় সেনের সঙ্গে এখানে এসেছে, একথা সবাই জানে। নেতাও দেখেছে। অতএব ভয় পাওয়ার কোনোও কারণ নেই।

সায়ন আবার উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল এবং এবারও বৃদ্ধা তাকে চেপে ধরল। সায়নের মনে পড়ল সুধাময় সেনের নির্দেশের কথা। সে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল। বৃদ্ধার চোখে এবার বিস্ময় এলো। ধীরে ধীরে তার হাতের আঙুল শিথিল হলো। সায়ন ভেবেছিল তখনকার মতো

এবারও বৃদ্ধা হাসি দেখলে খুশি হবে। কিন্তু···সে আর অপেক্ষা করল না। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ উপত্যকায় হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর পাথরের আড়াল সরতেই সে দৃশ্যটা দেখতে পেল। সমস্ত মানুষ পা মুড়ে বসে আছে। সামনে একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সুধাময় সেন কিছু বলছেন। তাঁর চারপাশে কয়েকজন ন্যাড়া মাথার মানুষ, এবং লম্বা চুল। সুধাময় কী বলছেন কিছুই বুঝতে পারছিল না সায়ন। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল সুধাময় গায়ের জামা খুলে ফেলেছেন। এখন তাঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিছুক্ষণ কথা বলার পর সুধাময় থামতেই লম্বাচুল ইশারা করল। দেখা গেল দুজন মানুষ হরিণটাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে মাঝখানে। রোগা মতন লম্বাচুল, যার গায়ে অনেক রকম রঙের দাগ, দ্রুত পায়ে নেমে এসে অবাধ্য হরিণটার শরীরে দু তিনটে চড় মারল কিছু বিড় বিড় করতে করতে। তারপর সরে দাঁড়িয়ে সমস্ত শরীর নাচিয়ে চিৎকার করে উঠল আকাশের দিকে মুখ তুলে। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন এগিয়ে এসে ধারালো কিছু দিয়ে আঘাত করল হরিণটার শরীরে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল হরিণটা। ফিনকি দিয়ে তার শরীর থেকে রক্ত ছিটকে উঠল ওপরে। সেই রোগা লম্বাচুল একটা কাঠের পাত্রে রক্তটাকে ধরে নিয়ে ছুটে উঠে গেল ওপরে। মোটা লম্বাচুল হাসি হাসি মুখ করে পাত্রের দিকে তাকিয়ে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাতেই সহর্ষ চিৎকার উঠল সমবেত দর্শকদের মধ্যে। সায়ন দেখল রোগা লম্বাচুল প্রথমে নেতার কপালে সেই রক্তের টিপ পরিয়ে দিল। তারপর একে একে এগিয়ে এলো সেই ন্যাড়া ঘোড়-সওয়ারের দল। কপালে রক্ত মাখায় ওদের আরও বীভৎস দেখাচ্ছিল। সায়ন লক্ষ্য করল, দর্শকদেরও ওই রক্ততিলক দেওয়া হলো না। ততক্ষণে হরিণটাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার কাজ চলছে। মোটা লম্বাচুল চিৎকার করে কিছু বলতেই জনতা উঠে দাঁড়াল। সায়ন লক্ষ্য করল। সুধাময় এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেছে ওই ঘোড়সওয়াররা। ওদের মুখে চোখে এখন সম্ভ্রমের ভাব।

ক্রমশ ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। সায়ন বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। প্রথমেই যে মানুষটার সঙ্গে দেখা হলো তার দিকে তাকিয়ে সে আকর্ণ হাসল। লোকটা কিন্তু হাসি ফিরিয়ে দিল না। বরং কিছুটা অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে তার দলের কাছে চলে গেল। সায়ন এগিয়ে গেল আর একটু। একটি বেশ সুন্দরী কিশোরী হাঁটতে হাঁটতে তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটির পোশাক অন্য মেয়েদের মতনই। কিন্তু এর গলায় ফুলের মালার গুচ্ছ ঝুলছে। সায়ন মেয়েটির চোখে বিস্ময় পড়তে পারল। যেন সে অদ্ভুত কিছু দেখছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সায়ন হাসল। এবং ছোট্ট হাসিটাকে টেনে বিস্তৃত করল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। তারপর হন হন করে চলে গেল যেখানে অন্য মেয়েরা আবার নাচ গানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে। হতভম্ব হয়ে গেল সায়ন। এই নিয়ে তিন-বার হলো। হাসি দেখলেই এরা সঙ্গ ত্যাগ করছে। অথচ সুধাময় সেন এবং লম্বাচুল তাকে হাসতে বাধ্য করেছিল। ওরা যেটাকে নিয়ম করেছিল, এরা সেটাকে সহ্য করছে না কেন?

সায়ন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একা। কেউ তার কাছে আসছে না। ওরা এখন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এমনকী লম্বা চুলদেরও দেখা যাচ্ছে না। সায়ন যেদিকে সুধাময় গিয়েছিলেন, সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। উপত্যকা শেষ হতেই সে ঘোড়াগুলোকে দেখতে পেল। অবিকল এদের দেখতে সুধাময় সেনের ঘোড়ার মতন যার পিঠে চাপার জন্যে তাকে চা-বাগান ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। এখান থেকে পাহাড়ের সরু পথ নীচে নেমেছে। সায়ন চারপাশে তাকিয়ে নীচে নামতে শুরু করল। সে রহস্যটা বুঝতে পারছিল না। সুধাময় এদের ভাষা এত চমৎকার শিখলেন কী করে? ন্যাড়ামাথা লোকগুলো ওঁকে সমীহ করছে কেন? তাই যদি হয় তা হলে সুধাময় তো ওদের অনুরোধ করতে পারেন তাকে চা-বাগানে পৌঁছে দিয়ে আসতে। কিন্তু সুধাময় তার কাছে অস্বীকার করেছেন, কোনো পথ তিনি চেনেন না। আরও কিছুটা যাওয়ার পর সে একটা বড়

গুহা দেখতে পেল। এখানে কোনো মানুষের সাড়াশব্দ নেই। বিচিত্র শব্দে পাখিরা ডেকে চলেছে। এমন কী, ইন্দ্রটাকেও ধারেকাছে দেখতে পেল না সে। সায়নের মনে পড়ল ইন্দ্রকে অনেকক্ষণ দেখছে না সে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখে প্রথমে কী করবে ঠাওর করতে পারল না সায়ন। এখন তার বেশ খিদেও পাচ্ছে। খিদে বেশি পেলে তার মাথা ঝিমঝিম করে। অথচ পেটে কিছু দেওয়ার মতো আয়োজন এখানে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। সে মন থেকে খাওয়ার চিন্তাটা সরাবার চেষ্টা করল। এখন সে চা-বাগানের ছোট্ট ছেলেটি নয়। তাকে এই কটা দিনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট বড় করে দিয়েছে। কিন্তু সুধাময় সেনকে এবার খুঁজে বের করা দরকার। ওই গভীর জঙ্গলের কোথাও ওঁরা গেলে খুঁজতে যাওয়া বোকামি হবে। বরং এই গুহাটাই দেখা যাক। সায়ন ধীরে ধীরে গুহাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে মানুষের যাতায়াত আছে। নিয়মিত হাঁটাচলার জন্যে একটা পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে।

সায়ন গুহার মধ্যে পা বাড়াল। ঘন ছায়ামাখা গুহার ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। দু'পা হাঁটতেই সে ইন্দ্রকে দেখতে পেল। ইন্দ্র একা নয়, তারই মতো দেখতে আর একটি রয়েছে পাশে। চিৎকার করতে গিয়েও তাকে চিনতে পেরে ইন্দ্র থেমে গেল। সঙ্গীটি উঠে ভেতরের দিকে যেতে চাইছিল বোধহয়, ইন্দ্র তাকে টেনে বসিয়ে দিল আবার। সে যেন ভাবভঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, এ আমার চেনা লোক, একে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ব্যাপারটা পুরো বিশ্বাসযোগ্য হলো না বোধহয়, সঙ্গীটি সতর্ক হয়ে বসে আড়চোখে তাকে দেখতে লাগল। সায়ন ওদের ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে যেতেই দু'দিকে দুটো বিশাল ঘরের মতো জায়গা দেখতে পেল। সেই ঘর দুটোয় স্তূপ হয়ে রয়েছে নানান ধরনের জিনিসপত্র। বড় বড় প্যাকিং বাক্স নজরে পড়ল ওর। বাক্সের গায়ে ইংরেজিতে কিছু লেখা। দূর থেকে আধো-অন্ধকারে সে স্পষ্ট পড়তে পারল না। তবে টি শব্দটা চোখ এড়াল না। এছাড়া ঘরজুড়ে রয়েছে অনেক রকমের জিনিস, যা শুধু

সভ্য জগতের মানুষই ব্যবহার করে। একটা অদ্ভুত ধরনের বাক্স দেখে এগিয়ে গেল সে। পিসবোর্ডের বাক্সটা ফেটে গেছে কিছুটা এবং তার ফাঁক দিয়ে ঝকঝকে কাঁচ দেখা যাচ্ছে। জিনিসটা কী দেখতে হলে প্যাকিং খুলতে হয়। সেটা করবে কি না ভাবছিল সায়ন। এইরকম গহন জঙ্গলে পাহাড়ের মধ্যে এই জিনিসগুলো এলো কী করে! বাইরের উপত্যকায় যাদের সে দেখেছে, তারা এখনও সভ্যতার সংস্পর্শে তেমন করে আসে নি। এইসব জিনিস ব্যবহার করবার সুযোগ তারা পাবে কোত্থেকে! সুধাময় কি এদের কথা জানেন? না, নিশ্চয়ই না। যে মানুষটা এতদিন পরেও জানে না যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কি না, ইংরেজ চলে গেছে কি না তার নিশ্চয়ই এই সমস্ত জিনিসপত্রের হদিস জানার কথা নয়। তা হলে এরা এলো কোত্থেকে?

সায়ন আরও একটু এগিয়ে গেল। এবার সে মানুষের গলার আওয়াজ পাচ্ছে। কয়েকজন যেন একসঙ্গে কথা বলছে। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কেউ কেউ। এবং তাদের থামিয়ে দিয়ে আব একটা গলা গর্জন করে উঠল। সায়ন খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছিল। গুহাটা এখানে বেঁকে গিয়েছে সে আর একটু এগিয়ে গেলেই মানুষগুলোকে দেখতে পাবে।

ধীরে-ধীরে পা ফেলে যেই সে মুখ বাড়াতে যাবে, অমনি মনে হলো চোখের সামনে হাজার-হাজার হলুদ ফুল পাক খেয়ে উঠল। মাথার পেছনে তীব্র একটা যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চেতনা হারিয়ে।

সায়নের যখন জ্ঞান ফিরল তখন বিকেল শেষ, কিন্তু অন্ধকার নামে নি। মাথার পিছনে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। হাত বোলাতেই মনে হলো আগের মতো উঁচু হয়ে আছে জায়গাটা। প্রচণ্ড টনটন করছে। কেউ তাকে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল। অথচ তার আশেপাশে কোনোও মানুষকে সে ছাখে নি। তার মানে যে এসেছিল সে চুপিসাড়ে এসেছিল। যে-ই মারুক

কয়েকজন লোকের সাড়া পেয়ে আড়াল থেকে দেখতে গেল···এমন সময় তার মাথার পিছনে তীব্র একটা আঘাতের যন্ত্রণায় সে জ্ঞান হারাল···

সে চায় নি সায়ন ওই গুহায় ঢুকুক। কেন? এই যন্ত্রণাতেও সায়নের চোখে বাক্সগুলো ভেসে এলো। ওই বাক্সগুলোর মধ্যেই নিশ্চয়ই কোনোও রহস্য আছে।

সায়ন চোখ তুলে তাকাল। কাছেপিঠে কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে তো গুহার মধ্যে শুয়ে নেই! দূরে ঝাপসা আলো দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই জায়গাটা বেশ স্যাঁতসেঁতে। সে উবু হয়ে বসল। এবং তখনই সে টের পেল, তাকে একটা বড় গর্তের মধ্যে ফেলে রেখেছিল ওরা। অনেক ওপরে মরা-আলোমাখা আকাশ ঝুলছে। গর্তটা নতুন খোঁড়া নয়। চারপাশে মসৃণ পাথর। সায়ন উঠে দাঁড়াল। খুব কাহিল লাগছে নিজেকে। মাথা দপদপ তো করছিলই, এখন পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অনেকক্ষণ না খেলে এই রকমটা হয় নাকি?

কিন্তু যারা তাকে এখানে রেখেছে, তারা কোথায়? এত নীচে সে এলো কী করে? ওরা নিশ্চয়ই ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি। তা হলে হাত পা মাথা আস্ত থাকত না। ওপর থেকে নীচে নামবার কোনোও রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। এই মুহূর্তে সায়ন বুঝতে পারল, সে বন্দী। এবং সেটা বোঝামাত্র একটা হতাশা এবং ভয় তার মনে ছড়িয়ে পড়ল। বন্দী করে রাখা হয় শত্রুকেই। সে যদি ওই মানুষগুলোর শত্রু হয়ে যায়, তা হলে এখানে থাকবে কী করে? এখনই সুধাময় সেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হওয়া দরকার। সায়নের মনে তীব্র অভিমান এলো, সুধাময় এতক্ষণ তার খবর না নিয়ে আছেন কী করে? তিনি নিশ্চয়ই জানেন না সায়নের অবস্থার কথা।

যেটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছিল এখন, তাতেই বোঝা গেল, সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। অবশ্য ইতিমধ্যেই গুহার মধ্যে আবছা অন্ধকার ছড়াচ্ছে সেইসঙ্গে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসছে মশারা। সায়ন দু'হাতের চাপে কয়েকটা মেরে হাঁ হয়ে গেল। প্রায় মাছির সাইজ এক-একটা। সায়ন দ্রুত গর্তের দেওয়াল হাতড়াতে লাগল। একটু পা রাখার মতো খাঁজ পেলেই

সে উঠে যেতে পারবে ওপরে। তারপরেই তার খেয়াল হলো, ওপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ওরা তাকে ধরে বেঁধে আবার নীচে ফেলে দিতে পারে। কিংবা আরও ভয়ানক ধরনের কিছু। অতএব তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠে কোনোও লাভ হবে না। আর একটু রাত হোক, আর একটু নির্জন হোক।
সায়ন দু' হাতে মশা তাড়াতে চেষ্টা করল। ওপরে কোথাও নিচু আওয়াজে মাদলের মতো বাজনা বাজছে। চা-বাগানের কুলি লাইনে যে তালে বাজে এটা সে তাল নয়। কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। সায়ন গর্তের একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, যাতে পেছন থেকে মশারা তাকে কামড়াতে না পারে। মাথার ওপর আকাশটা এখন প্রায় নিভে ঝাসপা হয়ে গিয়েছে। চারপাশে এমন অন্ধকার যে এক হাত দূরে কিছু আছে কি না ঠাহর করা যাচ্ছে না! কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর সায়নের চোখে জল এসে গেল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। বিশ্বচরাচর বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল সে। হঠাৎ মনে হলো, তার ডান হাতে ঠাণ্ডা কিছু স্পর্শ করছে। এতক্ষণ টের পায় নি, এখন দেখল হাতটাই শীতল হয়ে গেছে। সায়নের কান্না বন্ধ হলো। সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস পাশের দেওয়াল চুঁইয়ে আসছে গর্তের ভেতরে। যেহেতু সে আসার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে, তাই সেটা সরাসরি আঘাত করছে তাকে। এদিক থেকে বাতাস আসবে ভাবা যায় না। তারপরেই সায়নের মাথায় চিন্তাটা ঢুকল। বাতাস তো এমনি-এমনি আসতে পারে না। নিশ্চয়ই দেওয়ালটাতে ফাঁক আছে। অর্থাৎ গর্তটার এপাশে পাহাড় আড়াল হয়ে নেই।
অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল সে। মিনিট পনেরো চলে গেল, কিন্তু অবস্থার একটুও পরিবর্তন হলো না। হাওয়া আসছে ঠিকই, কিন্তু সেই আসার পথটাকে বড় করতে যে শক্তি এবং অস্ত্র দরকার তা সায়নের নেই। কিছু-ক্ষণের মধ্যে সে হতাশ হয়ে পড়ল। শুধু ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস পা চুঁইয়ে ঢুকছিল ভেতরে, সেটুকুই মুখে স্বস্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

অনেকক্ষণ মাথার ওপরে তাকায় নি সায়ন। এবার মুখ তুলতেই চিকচিকে কিছু দেখতে পেল। ওটা কি তারা? একটা তারা অত বড় হয়ে জ্বলছে? তার পরেই সে আকাশের এক কোণে কালো ছায়া দেখতে পেল। ছায়াটা যেন সামান্য ঝুঁকে সরে গেল আধুলির মতো নীলচে-ছাই আকাশটাতে তারাটাকে জ্বলতে দিয়ে। এবং সেই সময় একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করতে ছিটকে সরে গেল সায়ন। সরু এবং কিলবিলে কিছু তাকে স্পর্শ করে দুলতে লাগল দেওয়ালের পাশে। সাপ! শিউরে উঠল সায়ন। সাপটা ওপর থেকে নেমে এলো কী জন্যে? এই অন্ধকার গুহাটা কি ওর আস্তানা? কিছু সময় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকেও আক্রান্ত হলো না সে। অথচ যে-কোনোও মুহূর্তেই একটা তীব্র ছোবল আশঙ্কা করছিল। এবার একটু-একটু করে বুকে সাহস ফিরে এলো। সায়ন ওপরের দিকে তাকাল। অন্ধকারেব এক রকম মায়াবী আলো থাকে। খুব সন্তর্পণে সেই আলো আঁধারের গায়ে মিশে থাকে। অভ্যস্ত হয়ে গেলেই সেই আলোয় কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব। সায়ন দেখল। গর্তের ওপর থেকে সাপটা নেমে এসেছে এত নীচে। এখনও তার শরীরের শেষাংশ ওই উঁচুতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একটা সরু সাপ কি এত লম্বা হতে পারে? খামোখা ওটা ঝুলে থাকতে যাবেই বা কেন? কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর সায়নের মনে হলো, জিনিসটা দড়ি নয় তো? কিন্তু দড়ি ঠাণ্ডা হবে কেন? স্পর্শটা যে এখনও তার খেয়ালে আছে। সে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করল। জিনিসটা যাই হোক, একটুও নড়াচড়া করছে না। সায়ন দেখল ওপরের আকাশকে সামান্য আড়াল করে একটা ছায়া এগিয়ে এসেই আবার সরে গেল। যেন কেউ ঝুঁকে নীচের দিকে তাকিয়েই চলে গেল।

ওটা যে মানুষের ছায়া তা এতক্ষণে বুঝতে পারল সায়ন। মানুষটা নিশ্চয়ই সুধাময় সেন নন। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে উঁচু গলায় ডাকতেন। তখনই সায়ন স্থির বুঝল, ওটা সাপ নয়। প্রথম কথা এত দীর্ঘ সাপ হতে পারে না। লম্বা সাপেরা সরু হয় না। আর সাপের লেজ ওপরে আছে

এখনও, কোনোও মানুষ তা দেখেও বারে-বারে আসবে না। সায়ন এক পা এক পা করে এগোল। পাতলা অন্ধকারেও সে বুঝল, জিনিসটা স্থির হয়ে আছে। তার হাত কাঁপছিল। আচমকা সে স্পর্শ করতেই মনে হলো সমস্ত শরীরে উত্তাপ ফিরে এলো।

সাপ নয়, দড়ি নয়, একটা শক্ত সরু লতা ঝুলছে ওপর থেকে। ঠিক বেতের মতো ঠাণ্ডা। দু'হাতে লতাটা ধরে টানল সে। না, ওটা ওপর থেকে সর-সর করে নেমে এলো না। মনে হচ্ছে, লতাটার শেষ প্রান্ত কোথাও শক্ত করে বাঁধা আছে। সায়ন বুঝতে পারল, কেউ এই লতাটাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে তাকে সাহায্য করার জন্য, আর সে এতক্ষণ অযথা বোকার মতো ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে সাহায্য করবে কে ? সায়ন আর সময় নষ্ট করল না। দু'হাতে লতা আঁকড়ে ধরে বুঝল, এইভাবে ওপরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। সার্কাসের লোকরা যেভাবে দড়ি বেয়ে সর-সর করে ওপরে উঠে যায়, সে সেই কায়দাটা জানে না। কিন্তু তাকে ওপরে উঠতেই হবে। লতাটা আঁকড়ে ধরে সে গর্তের দেওয়ালে পা রাখল। সমস্ত শরীর টলছিল। কিন্তু একটু একটু করে সে হাতের মুঠো খুলে লতার ওপরের অংশ ধরতে পারল। এবার দুটো পা দেওয়ালের ওপরের অংশে নিয়ে গেল সায়ন। লতাটা খুব দুলছে। কিন্তু এই ভাবেই তাকে ওপরে উঠতে হবে। সায়ন বুঝতে পারছিল, একবার যদি তার হাত পিছলে যায় তা হলে একদম নীচে আছড়ে পড়তে হবে। কিন্তু লতাটা যেহেতু মসৃণ নয় তাই হাত আটকে থাকছে গাঁটে।

কত সময় লেগেছিল সায়ন জানে না, কিন্তু হঠাৎ সে সমস্ত আকাশটাকে তার ওপর উপুড় হয়ে আসতে দেখল। দু'হাতে গর্তের কিনারা ধরে শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে হাঁপাতে লাগল সায়ন। তারপর লতাটাকে টেনে জড়িয়ে নিল হাতে। হাতের নাগালের মধ্যেই একটা সরু গাছের গায়ে ওর শেষ প্রান্তটা বাঁধা ছিল। বসে বসেই সেটাকে খুলে নিল সে।

ধাতস্থ হওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সায়ন। যারা তাকে এই গর্তে

ফেলে রেখেছিল, তারা যদি জানতে পারে সে ওপরে উঠে এসেছে, তা হলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে না। সে দৌড়ে ওপাশে একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে এলো। এখন বেশ অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে। চারধার অত্যন্ত নিঃশব্দ। দুপুরে যে মানুষগুলো এখানে মেলা করে ছিল, তারা কেউ এখানে নেই। এবং এই সময় মৃদু শব্দ কানে আসতে চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই সে বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। পিছনে জঙ্গলের সীমানায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা সেই স্বল্পালোকে তাকে ইশারায় কাছে ডাকছে। সায়ন বৃদ্ধাকে চিনতে পারল। দুপুরে এরই পাশে ছিল সে। বৃদ্ধার মুখে সস্নেহ হাসি। কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সতর্কতা।

সায়ন আর কোনোও কিছু ভাবতে পারছিল না। বৃদ্ধা যখন তাকে দ্রুত সরে আসতে বলছেন, তখন তা মান্য করা উচিত। তাকে ছুটে আসতে দেখে বৃদ্ধা জঙ্গলের মধ্যে চলে এলো। সায়ন সামনে দাঁড়াতে দু'হাত নেড়ে প্রাণপণে ইশারা করতে লাগল বৃদ্ধা। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর সায়ন তার অর্থ ধরতে পারল। পালাও, এখানে থেকো না। দূরের জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে সেই আঙুলে আবার গর্তের ভেতরটা বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল বৃদ্ধা। ঠিক সেই সময় গলার স্বর শুনতে পেল ওরা।

বৃদ্ধা চকিতে সায়নকে টেনে নিয়ে এলো একটা গাছের আড়ালে। ওপাশে উপত্যকার ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে কয়েকজন মানুষ। তাদের মধ্যে সুধাময় সেনকে চিনতে পারল সায়ন। কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে ওরা। সুধাময়ের সঙ্গে যারা, তাদের প্রত্যেকের মাথা কামানো। বৃদ্ধা সায়নের হাত ধরে টানছিল স্থানত্যাগ করার জন্য। কিন্তু সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ উপত্যকার দিকে। কথা বলতে বলতে সুধাময় এসে দাঁড়ালেন সেই গর্তটার সামনে। ন্যাড়া-মাথা একটা লোক হাত-পা নেড়ে কিছু বোঝাচ্ছে তাঁকে। তার মানে সুধাময় জানতেন যে, তাকে ওই গর্তে ফেলে রাখা হয়েছে কিন্তু তিনি সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নি! সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল সায়নের কাছে। ওরা যে ভঙ্গিতে সুধাময়কে

খাতির করছে, তাতে তিনি ইচ্ছে করলেই সে বিপন্মুক্ত হতে পারে। কিন্তু সুধাময় সেই ইচ্ছেটা করছেন না। কারণ তিনি এখনও গর্তের পাশে দাঁড়িয়ে সহজ ভঙ্গিতে ওদের ভাষায় গল্প করে যাচ্ছেন। হঠাৎ সায়নের মনে পড়ল লতাটার কথা। ভাগ্যিস লতাটাকে খুলে নিয়ে এসেছে, নইলে এতক্ষণে ওরা টের পেয়ে যেত সে গর্তে নেই। সুধাময় কিছু বললেন। এবার একটা ন্যাড়া লোক সঙ্গের ঝোলা থেকে কিছু বের করে গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর ওরা যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গেল। ওরা গর্তে কী ফেলল? সায়নের মনে হলো, নিশ্চয়ই খাবার। সুধাময় তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খাবার দিয়ে গেলেন। এখন সায়নের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সুধাময় যা বলেছেন নিজের সম্পর্কে, সেটা কি সত্যি নয়? সে আসায় সুধাময় কি বিরক্ত হয়েছিলেন? এতদিনের ব্যবহারে সে-কথা মোটেই বুঝতে পারে নি সায়ন। কেউ বিরক্ত হয়ে কথা বললে তো বোঝা যায়! তাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ কি এইভাবে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই! তাই যদি হয়, সেটা তো তিনি তাঁর গুহাতেও করতে পারতেন। নাকি তার পক্ষে ওই বাক্সগুলো দেখাই চূড়ান্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে।

এই সময় বৃদ্ধা আবার তার হাত ধরে টানল। সায়ন ঘুরে দাঁড়াতে বৃদ্ধা হাঁটতে লাগল। জঙ্গলের পথ এদের এত চেনা যে অন্ধকারেও অসুবিধে হচ্ছিল না। এইসময় মাথার ওপর একটা রাতজাগা পাখি সুরেলা গলায় ডেকে উঠল কু-উ-ব্। সুর থাকলেও স্বরটা ভারী। এত বিপদের মধ্যেও সায়নের হঠাৎ মনে পড়ল, ঋজুদা-রুদ্রর গল্পের কথা। লেখক ঠিকই লেখেন, ঠিক-ঠিক।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বৃদ্ধা দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে দূরের জঙ্গল দেখিয়ে দিল। তার মানে ওই পথ দিয়ে চলে যাও। কিন্তু একা সে ওই জঙ্গলে রাতের অন্ধকারে কোথায় যাবে? কিছু বলার আগেই বৃদ্ধা তার অন্য হাতে রাখা একটা পাতায় মোড়া গোলাকার বস্তু তুলে দিল সায়নের হাতে। এই সময় দূরে কোথাও মাদল বেজে উঠতেই বৃদ্ধা চমকে উঠল।

দ্রুত হাতে চলে যেতে ইশারা করে সে ছায়ার মতো জঙ্গলে মিলিয়ে গেল। মাদলের শব্দটা কি কোনোও সঙ্কেত? সায়ন সামনে ছুটতে লাগল। খানিকটা খোলা জায়গা পেরিয়ে সে নতুন করে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর তার শরীর আর সইতে পারছিল না। প্রচণ্ড খিদে পাক খাচ্ছে পেটে। মাথা ঝিমঝিম করছে। ওরা যদি দ্যাখে সে গর্তে নেই, তা হলে কি খুঁজতে বের হবে? হঠাৎ তার মনে হলো নিস্তার নেই। ওই বাক্সগুলো দেখাই তার কাল হয়েছে। ওরা তাকে খুঁজে বের করবেই। এই জঙ্গলটা নিশ্চয়ই ওদের ভীষণ জানা।

এখন সে চলতে পারছে না। জঙ্গলে বন্য জন্তু অবশ্যই আছে। কী করবে প্রথমে ঠাহর করতে পারছিল না সায়ন। তারপর তার চোখে পড়ল বেশ ঝাঁকড়া ধরনের একটা গাছ এবং সেটার নীচের ডালটা বেশ কাছে। সায়ন স্থির করল, ওই গাছে উঠে আজকের রাতটা কাটিয়ে দেবে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে গাছের ওপরে আশ্রয় নিলে কিছুটা বিপদ কমবে। ডালটা ধরতে গিয়ে তার খেয়াল হলো, বৃদ্ধার দেওয়া বস্তুটার কথা। সন্তর্পণে পাতা সরাতে সায়ন চমৎকার একটা ঘ্রাণ পেল। চোখের সামনে নিয়ে এসে সে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝল, ওটা নরম সেঁকা-মাংস। নিশ্চয়ই সেই হরিণটার মাংসর ভাগ বৃদ্ধা পেয়েছিল, কিন্তু নিজে না খেয়ে তাকে দিয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল। এখন বুঝতে বাকি নেই, বৃদ্ধাই গর্তের মধ্যে লতা ঝুলিয়ে দিয়েছিল উঠে আসার জন্যে। মাঝে-মাঝে সে-ই ঝুঁকে দেখেছে গর্তে। সায়ন ঠোঁট কামড়াল। তারপর নিজেকে সামলে মাংসের একটা টুকরো জিভে দিতেই মুখ জলে ভরে গেল। আর এইসময় দূরে জঙ্গল ভাঙার শব্দ শুরু হলো। কালবিলম্ব না করে হাতের মাংস সামলে ঝাঁকড়া গাছের নিচু ডালটা ধরে ওপরে উঠতে লাগল সায়ন।

রাত্রে জঙ্গলে নানা রকমের শব্দ হয়। ঘুমন্ত গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাত-জাগা প্রাণীরা নিঃশব্দে চলাফেরা করলেও শব্দ সৃষ্টি হয়। যারা ডালপালা

ভাঙছিল তারা যে একদল দাঁতালো শুয়োর সেটা বুঝে কাঠ হয়ে বসল সায়ন। এখন নীচু থেকে কেউ তাকে চট করে দেখতে পাবে না। ডালটা বেশ চওড়া। খুব বেশি নড়াচড়া না করলে ঘুমিয়ে নেওয়া যায়।

মাংসটা খাওয়ার পর থেকে শরীরটা যেন আরও অবসন্ন হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু যদি ওপর থেকে পড়ে যায়, তা হলে দেখতে হবে না। তবু দুটো ডালের খাঁজে দুটো পা ঢুকিয়ে শরীরটা হেলিয়ে দিল সে মোটা ডালের ওপরে। এভাবে শোওয়া যায় না, কিন্তু তবু আরাম হচ্ছিল। সেই অবস্থায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সায়ন, তা সে নিজেই জানে না। হঠাৎ একটা চিনচিনে জ্বালা হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে পড়তেই তড়াক করে উঠে বসতে গিয়ে সামলে নিল সায়ন কোনোওমতে। আর একটু হলেই নীচে আছড়ে পড়তে হতো। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে বুঝল সে, জায়গাটা ফুলেছে। কাঠপিঁপড়ে কামড়ালে এইরকম ফোলে। জ্বলছে কিন্তু সহ্য করা যায়। আবছা অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আর একবার কামড় খাওয়া সুখের হবে না।

সায়ন চারপাশে তাকাল। রাতে গাছের শরীর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হয়, কাছাকাছি কোন্ গাছে ফুল ফুটেছে তা টের পাওয়া এখন অসম্ভব। কিন্তু সামান্য ঘুমিয়েও শরীরে যে ক্লান্তি তাই নিয়ে এই গন্ধটা ওর খুব ভালো লাগছিল। তা ছাড়া আবছা নীল একটা আলো-মাখা অন্ধকারে নীচের ঘাস-মাটি অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই সময় তার কাছে অন্যতর শব্দ এলো। খটাখট্ খটাখট্, শব্দটা যেন তাল মিলিয়ে বাজছে। সায়ন সতর্ক হলো। এবং একটু বাদেই সে অশ্বারোহীদের দেখতে পেল। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওপর থেকে সায়ন দেখতে পেল, ওরা সংখ্যায় সাতজন। সেই ন্যাড়া মাথা, কালো পোশাক এবং একই ঘোড়া। এই আবছা অন্ধকারে ওদের মাথাগুলো বীভৎস দেখাচ্ছিল। হৃৎপিণ্ড যেন ধক্ করে গলায় চলে এসেছিল সায়নের। একবার যদি ওরা ওপরে তাকায় তা হলে হয়তো দেখে ফেলবে। ওরা কি এখন তাকেই খুঁজছে? এরা কি

সুধাময় সেনের অনুগত নয়? নাকি সুধাময় তাকে খুঁজতে এদের পাঠিয়েছেন! দ্বিতীয়টি ঠিক বলে মনে হলো। সুধাময় সম্পর্কে জানতে জানতে সে আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। ঘোড়াগুলো খানিকটা এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এলো। লোকগুলো কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। পুতুলের মতো ওরা পাক খাচ্ছে একই জায়গায়। সায়ন ঝুলিয়ে-রাখা পা নিঃশব্দে টেনে নিয়ে মোটা ডালটার আড়ালে যতটা সম্ভব লুকিয়ে রাখছিল নিজেকে। এবং তখনই কনুইয়ে চিনচিনে জ্বালা, পর পর অনেকগুলো। যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়াল সে। পিঁপড়েগুলো এবার একসঙ্গে আক্রমণ করছে। কিন্তু সামান্য শব্দ করলেই আর দেখতে হবে না। সায়নের এইসময় মনে হলো, সে ধরা পড়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, নইলে জায়গাটা ছেড়ে নড়ছে না কেন! হয়তো এই অবধি এসেছে এরকম কোনোও চিহ্ন ওরা জঙ্গলে পেয়েছে। সায়ন ঠিক করল, যদি ওরা জেনেই থাকে তা হলে বললেই সে নামবে না। ওরা ওকে জোর করে না নামানো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঠিক এই সময় ওপাশের জঙ্গলে একটা আওয়াজ উঠল। মানুষেরই স্বর, কিন্তু চাপা এবং এমন বিকৃত যে চট করে মানুষের বলে মনে হয় না। সায়ন দেখল নীচের অশ্বারোহীরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠে সামান্য এগিয়ে থেমে গেল। যেন তারা অপেক্ষা করতে লাগল। এবং দলের কেউ চাপা গলায় ঠিক একই বিকৃত আওয়াজ তুলল। এবার অপর পক্ষ থেকে ঘন ঘন সেই আওয়াজের জবাব দেওয়া হলো। সায়নের স্বস্তি হলো, সে নিশ্বাস ফেলল। এরা তা হলে তার হদিস পায় নি, অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করতেই এখানে এসেছে। সায়ন গাছের ওপরে বসে দেখল দুটো উঁচু জিনিস উঠে আসছে দূরে। জঙ্গলের মধ্যে তাদের একবার দেখা যাচ্ছে আবার চোখের আড়াল হচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা এসে গেল। দুটো মানুষ পিঠের ঝুড়িতে প্রচুর জিনিস বয়ে নিয়ে এসেছে। জিনিসগুলোর পরিমাণ তাদের এমন আড়াল করে রেখেছিল যে দূর থেকে মানুষ বলে মনে হয় নি। অশ্বারোহীদের দেখামাত্র লোকদুটো জিনিস

নামিয়ে বেশ সম্ভ্রমে দূরে দাঁড়িয়ে হাসল। একজন অশ্বারোহী ইঙ্গিত করতে দৌড়ে একটা বাক্স তুলে আনল আগন্তুকদের একজন। বাক্সটা পিচবোর্ডের। এবং তোলার ধরনে বোঝা গেল খুব ভারী নয়। অশ্বারোহীর ইঙ্গিতে আগন্তুক বাক্সটা খুলল। সায়ন ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেল। একটা রঙিন বোর্ডের ওপর পর পর সাজানো হাতঘড়ি। লোকটি বোর্ডটি তুলতেই নীচে আর-একটা বোর্ড দেখা গেল এবং সেখানেও ঘড়ির সারি। অশ্বারোহী মাথা নাড়তে আগন্তুক খুশি-পায়ে ফিরে গেল বাক্সটা নিয়ে। সেটাকে ঝুড়িতে রেখে দু'বার মাথা ঝুঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অশ্বারোহী ইঙ্গিত করতে পাশের অশ্বারোহী ঘোড়ার শরীরে ঝোলানো একটা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল লোক দুটোর দিকে। ব্যাগটা লুফে নিয়ে সেটার ভেতর থেকে যা বের করল, সায়ন সেটা চিনতে পারল। পোড়া মাংস। লোক দুটোর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খাবার পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। অশ্বারোহীদের একজন ছাড়া সবাই বাক্সগুলো ভাগ করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। যে নেয় নি সে এবার দাঁড়িয়ে রইল এবং অন্যরা ফিরে গেল যে পথে এসেছিল। আগন্তুক দু'জন মাংস ভাগ করে খেতে খেতে অশ্বারোহীটির দিকে তাকিয়ে হাসল। লোক দুটো মধ্যবয়সী, ভালো স্বাস্থ্য, মুখে দাড়ি। পরনে আলখাল্লা জাতীয় পোশাক। খেতে-খেতে একজন এগিয়ে এলো সামনে। যেন খোশ-গল্প করতে চায় এমন ভঙ্গিতে ঘোড়াটার সামনে এসে হাত নেড়ে কিছু বলতেই অশ্বারোহী চিৎকার করে উঠল। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটা পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের জোড়া পা এমনভাবে আকাশে ছুঁড়ল যে লোকটা সাত পা পিছিয়ে দাঁড়াল। সায়ন বুঝতে পারল এই দু'জনকে পাহারা দেবার জন্যে এই অশ্বারোহীকে রেখে যাওয়া হয়েছে। লোক দুটো যেন আর ভেতরে ঢুকতে না পারে, তাই এই ব্যবস্থা।

মিনিট-পনেরো এইরকম কাটল। তারপর আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। সায়ন দেখল, এবার চারজন অশ্বারোহী ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে সেই লোকটা আছে, যে প্রথম কথা শুরু করেছিল। চোখের নিমেষে
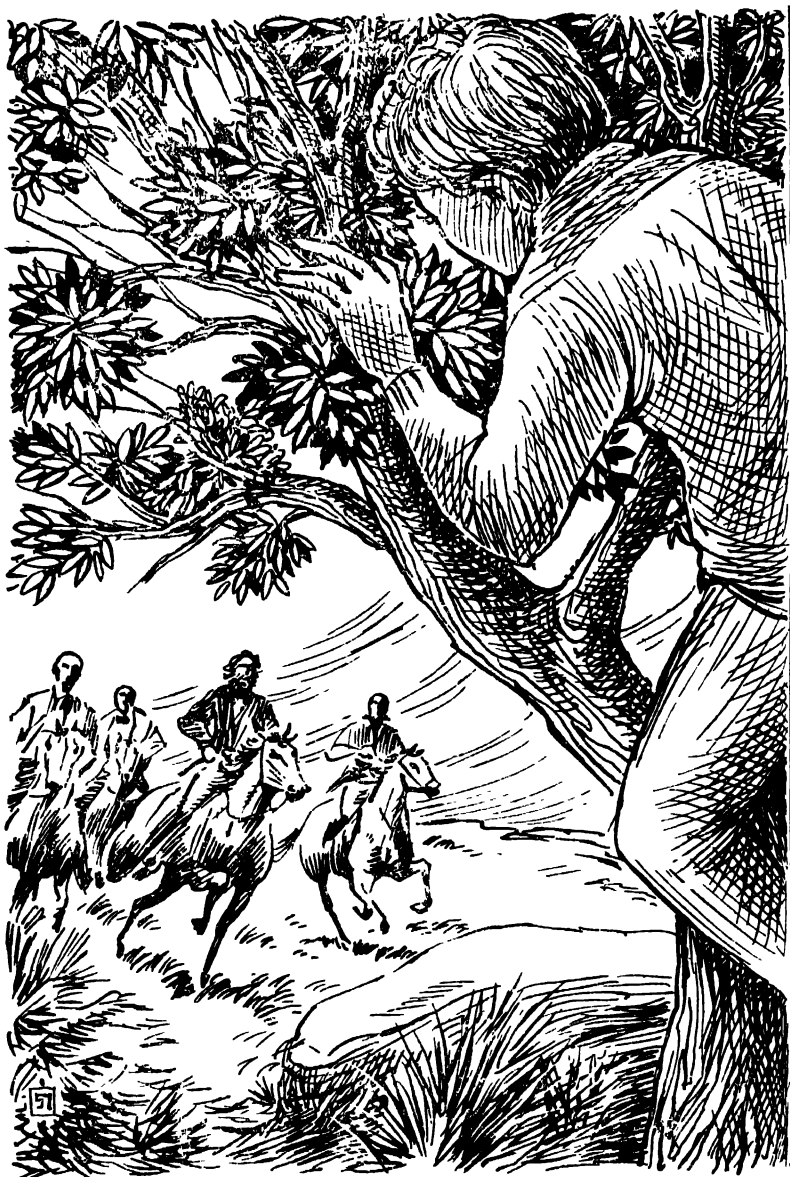
একটা গাছের উপর লুকিয়ে বসে সায়ন দেখল—সুধাময় সহ তিনজন
অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে···

কিছু বলার আগেই লোক দুটো দড়ির ফাঁসে আটকে গেল। সংবিৎ ফিরতেই তারা চিৎকার করে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করল না অশ্বারোহীরা। টানাটানিতে লোক দুটো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় তাদের কিছু দূর টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। সায়নের মনে হচ্ছিল, তার বুকে এক ফোঁটা বাতাস নেই। ওই নির্বাক অশ্বারোহীদের ভঙ্গি দেখে মানুষ বলে ভাবা কঠিন। অমন শক্তিশালী লোক দুটো এখন অসহায় হয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এরা যদি গাছের ওপরে উঠে আসে তা হলে নিজের কী অবস্থা হবে কল্পনা করতেই শিউরে উঠল সে। লোক দুটো মাটিতে পড়ে চেঁচাচ্ছে আর অশ্বারোহীরা নিরাসক্ত মুখে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। এই সময় ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল। সায়ন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দুটো ঘোড়া কয়েকটা বাক্স বয়ে আনছে। তার আগে-পিছে আরও তিনটে ঘোড়ায় তিনজন মানুষ বসে। প্রথমে যে আসছে তাকে দেখে চমকে উঠল সায়ন। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল সে ডালটাকে। অপেক্ষারত অশ্বারোহীরা বেশ সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিল। শুধু নেতা বলে মনে হচ্ছিল যাকে, সে সুধাময়ের ঘোড়ার পাশে নিজের ঘোড়া নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে যা বলল তা বিন্দুমাত্র বুঝতে পারল না সায়ন। সুধাময় এবার পড়ে-থাকা লোক দুটোর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ জ্বলছিল। সায়নকে অবাক করে দিয়ে সুধাময় পরিষ্কার হিন্দীতে চিৎকার করে উঠলেন, "এই বদমাশ জোচ্চোরের দল, বাকি মাল কোথায় রেখেছিস বল?"

লোক দুটো যেন আচমকা চিৎকার থামিয়ে বোবা হয়ে গেল। সুধাময় চাপা গলায় বললেন, "চুপ করে থেকে কোনোও লাভ হবে না। এর আগের দুই ট্রিপে তোরা জালি মাল গছিয়ে গেছিস। তখন আমি এখানে ছিলাম না, এরাও বুঝতে পারে নি। মালগুলো কোথায়?"

হঠাৎ শায়িত দু'জন মানুষের একজন উঠে বসে বিপর্যস্ত গলায় বলে উঠল, "আমাদের যা দেওয়া হয়েছে, তাই নিয়ে এসেছি। কী আছে না আছে আমরা জানি না, বিশ্বাস করো।"

সুধাময় হাসলেন, "ঠিক আছে। যারা তোদের পাঠিয়েছে তাদের শিক্ষা হওয়া দরকার। তোরা যদি ফিরে না যাস তা হলে ওরা টের পাবে।"
কথা শেষ করে অশ্বারোহীদের ভাষায় কিছু বলতেই একজন নেমে এলো। সায়ন কিছু বুঝে-ওঠার আগেই লোকটা চকিতে শূন্যে হাত তুলল। এবং তারপরই এই রাতের গভীর জঙ্গল কাঁপিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো একজন শায়িত বন্দীর গলা থেকে। আহত জন্তুর মতো সে ছটফট করতে লাগল, গলায় গোঙানি-মেশানো কান্না। যে লোকটা হাত তুলেছিল সে নির্লিপ্ত মুখে একটা সরু ধারালো ইস্পাতের ফলা গাছের পাতা ছিঁড়ে মুছছিল। হঠাৎ সায়নের মাথাটা ঘুরে গেল। সে চোখ বন্ধ করল। তার দুটি হাত প্রাণপণে গাছটাকে আঁকড়ে ধরল। মাথার মধ্যে অজস্র ফুলকি এবং সমস্ত শরীরে রিমঝিম ভাব, সায়নের কিছু করার ছিল না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার একটা বোধই কাজ করছিল, তাকে কোনোওরকমে নিঃশব্দে এই গাছের ডালে বসে থাকতে হবে। সে আর চোখ খুলছিল না। কিন্তু বন্ধ চোখের পাতায় একটা হাত কেমন আঠার মতো সেঁটে আছে, সেটাকে সরাতে পারছিল না। যে হাত বন্দী লোকটির শরীর থেকে ছিটকে ঘাসের ওপর পড়েছে একটু আগে। কী নির্বিকার ভঙ্গিতে অশ্বা-রোহীটি হাতটাকে শরীর থেকে ছেদ করল। এই সময় সুধাময় হিন্দীতে চিৎকার করলেন, "আমার এই ভালো-মানুষ পাহাড়ি লোকগুলোকে তোরা ঠকাচ্ছিস। অথচ তোদের ঠিকঠাক দাম এরা দিয়ে যাচ্ছে। শোন, তোরা কেউ ফিরে যাবি না। তোদের মালিকরা জানতে চাইলে জানবে তোরা কেউ এখানে আসিস নি, কোনোও মাল এরা পায় নি।"
কথা শেষ করে সুধাময় ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন। সমস্ত দলটা একে একে চলে যাচ্ছিল। এইসময় অপর বন্দীটি চিৎকার করে ওদের থামতে বলল। সুধাময় ঘোড়ার মুখ না ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। আহত সহকর্মীটির দিকে এক পলক তাকিয়ে লোকটি মিনতি করে উঠল, "দোহাই তোমার, আমাদের তোমরা মেরো না। আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দাও।"

সুধাময়ের ঘোড়াটা সামান্য এগিয়ে গেল। যেন এইসব প্রলাপের জন্য সময় নষ্ট করার কোনোও মানে হয় না। ওরা চলে যাচ্ছে দেখে লোকটা কেঁদে উঠল চিৎকার করে, "থামো তোমরা, আমি জানি মালগুলো কোথায় আছে। আমি নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এর জন্যে ··"

সঙ্গে-সঙ্গে সুধাময়ের ঘোড়াটা মুখ ফেরাল। ধীর পায়ে সেটা এগিয়ে গিয়ে লোকটির পাশে দাঁড়াতেই সে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে ভেঙে পড়ল। সুধাময় গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ?"

লোকটি হাত তুলল, "এখান থেকে বেশ দূরে, নদীর কাছে। আমাকে নিয়ে গেলে দেখিয়ে দিতে পারব।"

সুধাময় মাথা নাড়লেন। তারপর অশ্বারোহীদের ভাষায় কিছু বলে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন যে পথে এসেছিলেন সদলে। সায়ন ওঁর চলে যাওয়া দেখছিল। এই সময় আকাশ কাঁপিয়ে একটা আর্তনাদ উঠল। শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল সে। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার শরীর।

ওই অবস্থায় কতক্ষণ ছিল সায়ন জানে না। তবে সে গাছের ওপর কোনোওরকমে থেকে গিয়েছিল। যখন সে নীচের দিকে তাকাল, তখন কোনোও অশ্বারোহী সেখানে নেই। যে বন্দীটি স্বীকার করেছিল অপরাধের কথা, তাকেও দেখতে পেল না সে। কিছুক্ষণ সতর্কভাবে বসে থেকে সায়ন ঠিক করল, গাছ থেকে নেমে আসবে। এভাবে সে আর বসে থাকতে পারছে না। এখন কাছেপিঠে কোনোও মানুষ নেই। যতটা সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। সে ধীরে এবং নিঃশব্দে মাটিতে নামল। তখনই সে দুটো জন্তুকে দেখতে পেল। শেয়াল কিংবা নেকড়ে নয়। কিন্তু ধরনটা ওই রকমের। তাকে দেখে ওরা সরছে না, সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। সায়ন একটা ছোট্ট নুড়ি তুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতেই ভয় পেল জন্তু দুটো। চট করে জঙ্গলের আড়ালে চলে যেতে সায়ন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটি মানুষ পড়ে আছে জঙ্গলের মধ্যে। জন্তু দুটো সেই মানুষটাকে খাচ্ছিল। পোশাক দেখে চোখ বন্ধ করল আবার।

তারপর মুখ ফিরিয়ে ছুটতে লাগল উলটো দিকে। সেই বন্দীটি, যাকে
আহত করা হয়েছিল, মাল চুরির জন্যে যাকে দায়ী করেছিল সঙ্গীটি
তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। একটু আগে ওরই চিৎকার শুনেছে সে। মৃত
দেহটাকে এখানেই ফেলে গেছে ওরা। এখন জন্তুরা সব ছিঁড়ে খাচ্ছে
লোকটাকে।

সায়ন প্রাণপণে ছুটছিল। লতায় জড়িয়ে কয়েক বার আছাড় খেল সে
সুধাময় সেন যে কতখানি নিষ্ঠুর সেটা চোখের সামনে দেখে সে শিউরে
উঠছিল। এই মানুষটির সঙ্গে সে কয়েক দিন একসঙ্গে ছিল অথচ এসব
ব্যাপার কখনও অনুমান করতে পারে নি।

সায়ন হাঁফিয়ে পড়েছিল। জঙ্গলটা এখানে আচমকা শেষ হয়ে গেছে
খানিকটা ন্যাড়া জায়গা, তারপর আবার জঙ্গলের শুরু। এখনও আলো
ফোটার কোনোও আয়োজন নেই। ন্যাড়া জায়গাটা সোজাসুজি পার হতে
সায়নের খুব ভয় করছিল। যদি কেউ এখানে থাকে তা হলে সহজেই সে
ধরা পড়ে যাবে। এতদূর পালিয়ে এসে বোকার মতো ধরা পড়ার কোনোও
মানে হয় না। সায়ন জঙ্গলের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পর আর
পা ফেলার জায়গা পেল না। জঙ্গলটা এমন কালো এবং বুনো যে মনে হয়
কেউ কোনোওদিন সেখান দিয়ে যায় নি। আর ওখান থেকেই পাহাড়টা
ঢালু হয়ে নীচে নেমে গেছে। কী করবে যখন ঠাহর করতে পারছে না, ঠিক
তখনই সায়ন পেছনের জঙ্গলে একটা শব্দ শুনতে পেল। যেন ভারী কিছু
গাছপালা ভেঙে এগিয়ে আসছে। মানুষ এইভাবে শব্দ করে এগিয়ে
আসবে না। আর এখন এই অবস্থায় মানুষ এবং জন্তুর কোনোও প্রভেদ
তার কাছে নেই।

সায়ন আর দাঁড়াল না। যা হবার হবে এমন একটা ভাবনা তাকে পেয়ে
বসল। সে যখন ন্যাড়া জায়গাটা পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকল, তখন
আকাশে শুকতারা ফুটেছে। নিশ্বাস স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। তার

ায়ন হাঁটতে গিয়ে একটা পথ দেখতে পেল। পায়ে-চলা কিংবা ঘোড়ায়-লা পথ বলে মনে হলো ওর। কিছুটা দ্বিধা করেও সেই পথ ধরল সায়ন এবার তার হাঁটতে বেশ সুবিধে হচ্ছে। পথের পাশে পড়ে-থাকা একটা শক্ত ডাল সে কুড়িয়ে নিল। মনে হয় এটাকে কেউ ব্যবহার করেছিল। তার মানে মানুষের নিয়মিত যাতায়াত আছে এই পথে। কিন্তু তারা যখন গুহা ছেড়ে এখানে এসেছিল, তখন অন্য পথ ব্যবহার করেছিল। হয়তো ওই বন্দী দুটো এই পথেই এসেছিল। সায়ন খুব সতর্ক হয়ে হাঁটছিল। জঙ্গলের আশেপাশে অনেক রকম জন্তুর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আর ওদের নিয়ে চিন্তা করছিল না সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, তাকে পালাতে হবে। কোনোও হিংস্র জন্তুর মুখোমুখি না পড়ে গেলে ওদের ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু যে-দৃশ্য একটু আগে সে দেখে এসেছে তারপর ওদের হাতে পড়া মানে···জোরে পা চালাতে গিয়ে সায়ন টের পেল, তার পা শক্ত হয়ে আসছে। শিরায় শিরায় টান পড়ছে। এবং তখনই অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল সে। শব্দটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কী, সে যে পথে যাচ্ছে সেই পথেও তার দিকে শব্দটা এগিয়ে আসছে। সায়ন খুব নার্ভাস হয়ে পড়ল। এইভাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে-থাকা বিপজ্জনক। সে দৌড়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে এসে দাঁড়াতেই শব্দটা সোচ্চার হলো। কোনোওরকমে গাছের ওপরে উঠে বসতেই সায়ন হাতিগুলোকে দেখতে পেল। দল বেঁধে ওরা জঙ্গল ভাঙতে-ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছে নীচে। সংখ্যা গোটা-বারো হবে। ওরা চলে যাওয়ার পর আবার শব্দ উঠল। জীবনে প্রথম বাইসন দেখল সে। বাইসনরাও তা হলে দল বেঁধে যাতায়াত করে? ওদের গন্তব্যস্থল হাতিদের মতো। এভাবে এইসময় কোথায় যাচ্ছে ওরা? সায়ন আকাশের দিকে তাকাল। নীল আকাশে এখন অন্ধকারের ছায়া নেই। তারাগুলোকে বড্ড হলুদ দেখাচ্ছে। রাতের শেষ কিন্তু দিনের শুরু হয় নি। সায়ন আর-একটা ডাল ধরে ওপরে উঠে এলো। যে-দিকে চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। দেখতে-দেখতে হঠাৎ তার চোখ আটকে গেল।

বেশ কিছুটা দূরে একটা ঢালু জায়গার মুখে পাথরের আড়ালে সেই অশ্বারোহী দাঁড়িয়ে আছে, যে প্রথমে বন্দী দুটোর পাহারায় ছিল। তার হাতের দড়ি চলে গিয়েছে সেই বন্দীটির কোমরে। এই দু'জন ছাড়া চরাচরে আর কেউ নেই। ওরা নড়ছে না, নিঃশব্দে কোনোও কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। সায়ন বুঝল, বন্দীটিকে লুকিয়ে রাখা মালের হদিস দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওর দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, কোমরে দড়ি। কিন্তু ওরা অপেক্ষা করছে কিসের জন্যে?

তারপরেই বুঝতে পারল সায়ন। হাতি এবং বাইসনগুলোর সামনে বোধ-হয় ওরা পড়তে চায় না। ওদের চলে যেতে দিচ্ছে অশ্বারোহী। লোকটি বলেছিল নদীর কাছে আছে মালগুলো। তা হলে কি ওরা নদীর কাছা-কাছি এসে গেছে?

সায়ন দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এলো। তারপর নিঃশব্দে দৌড়াতে লাগল। অশ্বারোহী এবং বন্দীটিকে হারালে চলবে না।

কাছাকাছি এসে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল সায়ন। অশ্বারোহী এবং লোকটি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, এমনকি, ঘোড়াটা পর্যন্ত নড়ছে না। সব শব্দ মিলিয়ে গেলে অশ্বারোহী ইঙ্গিত করল লোকটিকে এগিয়ে যেতে। ঘাবড়ে গিয়ে লোকটি উদ্বেগের আঙুল তুলে দূরে দেখাল। অশ্বারোহী সেদিকে এক পলক তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ভঙ্গিটা এমন, আমি কোনোও কথা শুনতে চাই না, তোমাকে যেতেই হবে।

সায়ন যতটা পারে সাবধানে ওদের অনুসরণ করছিল। ঠিক এই মুহূর্তে শরীরে কোনোও ক্লান্তি টের পাচ্ছে না সে। বারংবার তার মনে হচ্ছে, এই পথে গেলেই সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। যে-পথে বাইরের দুটো মানুষ এখানে পৌঁছতে পারে, সেই পথ সে খুঁজে পেয়েছে। মাথার ওপরের আকাশটা দ্রুত রঙ পালটাচ্ছে। অবশ্য সেদিকে তাকাবার সময় ছিল না সায়নের। তার একমাত্র লক্ষ্য অশ্বারোহী এবং নিঃশব্দে এগিয়ে

যাওয়া। এবার অশ্বারোহী বেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ সে দুর্বোধ শব্দে তাড়া দিচ্ছিল, যাতে লোকটা দ্রুত হাঁটে। মাঝে-মাঝেই চারপাশে তাকিয়ে নিচ্ছিল। সেটা কী কারণে সায়ন জানে না, কিন্তু রাতটা খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। এবার ওরা ঢালুর দিকে নামছে। সায়ন থমকে গেল। এতক্ষণ সে গাছের আড়ালে-আড়ালে ছিল। যদি অশ্বারোহী চট করে মুখ ফেরায়, তা হলে সে ধরা পড়ে যাবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ওদের অনেকটা নামতে দিল সায়ন। তা ছাড়া তার মনে হলো, একটু আগে যে জন্তুরা ছুটে গেছে পাগলের মতো, সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে তারা ফিরে আসবে এই পথে। আর যাই হোক তাদের সামনে পড়াটা মোটেই উচিত কাজ হবে না। অন্ধকারে নিশ্চিত পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু অন্ধকারও যে অনেক সময় খুব সহায়ক হয় তা এর আগে তার জানা ছিল না। এখন যখন চারধারে সূর্যদেবকে অভ্যর্থনা কবার আয়োজন চলছে, তখন একই সঙ্গে ভালো লাগা এবং ভয় তাকে অধিকার করল। ওরা নিশ্চয়ই খুঁজতে বের হবে, এবং তাকে ধরতে হয়তো বেশি অসুবিধে হবে না।

কারও কোনোও সাড়াশব্দ নেই, শুধু পাখিরা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই অবস্থায় সায়নের মনে হলো কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। একটা অস্বস্তি-কর অনুভূতি সায়নকে সতর্ক করল। এবং তখনই সে জঙ্গলের আড়ালে দুটো চোখ দেখতে পেল। লোভী চকচকে এবং কুটিল চোখ। সায়ন আর অপেক্ষা করল না। দ্রুত লাফ দিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে লক্ষ্য করল, একটা হলদেটে আভা চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল। গলার কাছে হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছিল প্রায়, বুকের খাঁচায় কোনোও বাতাস নেই, কিছুটা জায়গা অতিক্রম করতেই জলের শব্দ শুনতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে সভয়ে দেখল কাছাকাছি সেই চোখ নেই। ওটা বাঘ কিংবা ওই ধরনের কিছু। এত বড় জঙ্গলে সবাই তো থাকতে পারে। কিন্তু এই প্রথম সে হিংস্র চোখ দেখতে পেল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সেই চোখ-

জোড়া হাল ছেড়ে দেবে না।

পথ একটা আছে। ঘাস এবং বুনো আগাছার ওপর পায়ের চাপ পড়লে একটা দাগ ফুটে ওঠে। সেটা যদিও নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ায় অস্পষ্ট, তবু চিনতে অসুবিধে হলো না। দ্রুত পা চালাল সায়ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নদীর গায়ে এসে পড়ল। একে নদী না বলে তীব্র জলপ্রবাহ বলাই ভালো। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গোঙানির মতো শব্দ ছিটকাচ্ছে। বুনো আগাছায় ভর্তি বলে ওই জলের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই সময় কচি কলাপাতার মতো নরম রোদ টুক করে নেমে পড়ল গাছের মাথায়, নদীর বুকে। আলো ফুটছে, কিন্তু খুবই আদুরে ভঙ্গিতে। সায়ন আর একবার পেছনে তাকাল। অনেকটা দেখতে পাচ্ছে সে। জন্তুটা যদি কাছাকাছি থাকত, তা হলে দেখতে পেত সে। হয়তো রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে। সামনে পা ফেলতেই কান্না শুনতে পেল সায়ন। ককিয়ে, আচমকা আঘাত খাওয়ার পর যেমন মানুষ কেঁদে ওঠে, ঠিক সেই আওয়াজ। একটু থমকে থেকে সে শব্দটা অনুসরণ করে সামান্য এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল। লোকটা মাটিতে উবু হয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে, আর অশ্বারোহী চাপা গলায় কতগুলো অবোধ্য শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে রাগত ভঙ্গিতে। লোকটার পিঠের জামা ফালা-ফালা করে ছেঁড়া। সম্ভবত আঘাত লেগেছে ওখানেই। অশ্বারোহী আবার ঘোড়া চালাল। টান পড়ল দড়িতে। লোকটা একটু ঘষটে এগিয়ে যেতে যেতে কোনোওরকমে উঠে সোজা হলো। তারপর ঘোড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটতে লাগল। অশ্বারোহীর মধ্যে বেশ ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছিল। সায়নের মনে হলো দিনের আলো ফুটে যাওয়ার পর থেকেই লোকটা অস্থির হয়ে উঠেছে। এখন ওর সেই সতর্ক ভাবটা চলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। এতে সুবিধে হলো সায়নের। সে চট করে ধরা পড়বে না। যদিও মাথার ওপরে সমানে পাখিরা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এত ভোরে মানুষ দ্যাখে নি বোধহয় কখনও।

মিনিট দশেক চলার পর জলপ্রবাহ যেখানে একটু স্থির, এবং বোঝা যায় জল বেশ কম, সেখানে এসে লোকটা চিৎকার করে অশ্বারোহীকে দাঁড়াতে বলল। অশ্বারোহী ঘুরে তাকাতে সে নদীর অপর প্রান্ত নির্দেশ করল। ব্যাপারটা একদম মনঃপূত হচ্ছিল না অশ্বারোহীর। পার হবার কোনোও ইচ্ছেই হচ্ছিল না তার। প্রায় বাধ্য হয়ে সে লোকটাকে নদীতে নামতে বলল। এবং সেই সময় ঘোড়াটা চাপা ডাক ডাকল। কিছুতেই সে জলের কাছে যেতে চাইছিল না। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে পড়ল। কিন্তু তাতে তুটো পা পিছিয়ে গেল ঘোড়াটা। অশ্বারোহী শেষমেশ নীচে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়াটাকে কিছু বলল। সায়ন একটা বিশাল শাল-গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ন্যাড়া লোকটিকে লক্ষ্য করল। উচ্চতা বেশি নয়। পাহাড়ি মানুষের সবরকম বৈশিষ্ট্য ওর আছে। কিন্তু এই রকম কঠিন মুখ সে ত্মাখে নি কখনও। স্নেহ দয়া মায়া জাতীয় বোধের সঙ্গে যেন কোনোও-দিন পরিচিত নয় ওই মুখ। লোকটা কোমরে হাত দিয়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। যেন খুঁটিয়ে জল পরীক্ষা করল সে। এই জায়গায় পাড়ের কাছে কোনোও আগাছা নেই। পারাপারের জন্যে চমৎকার জায়গা। ফিরে এসে ঘোড়ার শরীর থেকে লোকটির কোমরে বাঁধা দড়ির অন্য প্রান্তটি খুলে নিয়ে সে ইঙ্গিত করল লোকটাকে জলে নামতে। তারপর ঘোড়াটাকে চিৎকার করে বলল কিছু। এসব শব্দের মানে সায়নের বোধগম্য নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গি অনেক সময় অর্থ বুঝিয়ে দেয়।

মালবাহক লোকটা জলে নামল। বড়জোর হাঁটু পর্যন্ত জল। কিন্তু সামান্য যে স্রোত বইছে তাই তাকে স্থির পদক্ষেপে হাঁটতে দিচ্ছিল না। তার তু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা বলে হাঁটতেও অসুবিধে হচ্ছিল। তা ছাড়া কোমরের দড়ির প্রান্ত লোকটি ধরে রেখেছিল শক্ত করে। বোঝা যাচ্ছে অশ্বারোহী জলের চরিত্র জানে। কারণ তার পদক্ষেপ বেশ মাপা এবং স্রোতের টানে সে সরছে না। একসময় ওরা জলপ্রবাহ পার হয়ে গেল।

সায়ন আর ওদের দেখতে পেল না। ঘোড়াটা অস্থির হয়ে পা ঠুকছে। এই সময় জলে অন্যতর শব্দ হলো। খুব বড় মাছ ঘাই মারলে জল যেরকম তোলপাড় হয়ে ওঠে, সেই রকম দেখতে পেল সায়ন। ওর চকিতে মনে পড়ে গেল প্রথম রাত্রের কথা। নদী পার হওয়ার সময় সে ঘোড়ার পিঠে বসে ওইরকম শব্দ শুনেছিল এবং ঘোড়াটা ভয়ে এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছিল যে, সে ছিটকে পড়েছিল ডাঙায়। সায়ন দেখল এই ঘোড়াটা শব্দ শোনামাত্র অনেকটা ওপরে সরে এলো এবং তখনই সে ধরা পড়ে গেল। চোখাচোখি হতে ঘোড়াটা স্থির হয়ে গেল। সায়ন ওপরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। খুব সাহস করে সে চুকচুক শব্দে ডাকল ঘোড়াটাকে। ওর কান খাড়া হয়ে উঠল, কিন্তু নড়ল না। আড়াল ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই ঘোড়াটা সরে যাওয়ার ভান করল, কিন্তু সরল না। সায়নের কেবলই মনে হতে লাগল, এটা সেই ঘোড়াটাই, অতএব সে ওকে বশ মানাতে পারবে; এবং সেটা সম্ভব হলো। দু'তিনবার লুকোচুরি খেলার পর ঘোড়াটা সায়নকে ওর গলায় হাত রাখতে দিল। খানিকটা আদর করার পরই সে ঘোড়াটাকে আস্তে-আস্তে টেনে নিয়ে এলো গাছের আড়ালে। এবং তখনই জলপ্রবাহের অপর প্রান্তে প্রাণ-কাঁপানো আর্তনাদ উঠল। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের জন্যে, তারপর চুপচাপ হয়ে গেল চরাচর। এমনকি পাখিরাও ডাক বন্ধ করল।

সায়ন আতঙ্কিত চোখে অপর পারের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই সময় অশ্বারোহীকে দেখা গেল, সে এবার একা এবং তার কাঁধের ওপর বিশাল একটা বস্তা। ওজন নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল লোকটার। সায়ন বুঝতে পারল মালবাহক লোকটার অবস্থা তার সঙ্গীর মতনই হয়েছে। মাথা নীচু করে থাকায় অশ্বারোহীর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু সেটা দেখতে পেলেও বোঝা যেত না সে একটু আগে অমন কাণ্ড করে এসেছে। নদীর প্রান্তে এসে লোকটা চিৎকার করে ডাকল। ডাকটা যে ঘোড়ার উদ্দেশে সেটা সায়ন বুঝতে পারল ঘোড়াটার চঞ্চলতা দেখে। "উস্থ"। দ্বিতীয়বার

চিৎকারটা হতেই ঘোড়াটা ছুটে নেমে গেল নদীর কাছে। তারপর ধীরে-ধীরে পিছিয়ে এলো। লোকটা বিরক্ত হয়ে বুঝল সে ঘোড়াটাকে এপারে নিয়ে এসে মাল বওয়াতে পারবে না। সায়ন আড়াল থেকে দেখল, লোকটা আবার জলে নামল। এখন নদী পার হয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে লোকটা ফিরে গেলে সে কী করবে? তার কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কোনোওমতে ওই ঘোড়াটাকে পাওয়া যেত তা হলে পালানো সুবিধেজনক হতো। সে চাপা গলায় ডাকল, "উস্থু!" সঙ্গে সঙ্গে কান খাড়া করে এদিকে মুখ ফেরাল ঘোড়াটা। ওর নাম যে উস্থু তা বুঝতে পেরে সে দ্বিতীয়বার ডাকল। লোকটি এখন নদীর এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করেছে। কিন্তু মালের ভারে সে সহজে হাঁটতে পারছে না। অন্তত যাওয়ার সময় যে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি ছিল সেটা নেই। বারংবার সে স্রোতের টানে পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছিল। এই সময় সে যদি আবার ঘোড়াটাকে ডাকে তা হলে সেটা লোকটার কানে যেতে পারে। সময় ফুরিয়ে আসছে, সুযোগ চলে যাচ্ছে সামনে থেকে। সায়ন কী করবে বুঝতে পারছিল না। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসে যদি সে ঘোড়াটাকে না পায়, তা হলে তার অবস্থা মালবাহকের মতো হবে। সায়ন হতাশ হয়ে দেখল অশ্বারোহী নদী পার হয়ে এসেছে। পার থেকে চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে সে সমানে গালাগালি করছে ঘোড়াটাকে, এবং সেই সময় কাণ্ডটা ঘটল। হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ল লোকটার ওপরে। সায়ন স্পষ্ট জলের ওপর একটা লেজের ঝাপটানি দেখতে পেল। চকিতে ঘোড়াটা ছুটে এলো তার কাছে। আর আকাশ-কাঁপানো আর্তনাদ করে উঠল অশ্বারোহী। তার কাঁধ থেকে বস্তাটা ছিটকে পড়ল পাড়ের কাছে। দু'হাতে নিচু হয়ে জলের মধ্যে থেকে কিছু ছাড়াতে গেল যেন। কিন্তু তারপরেই তলিয়ে গেল সে। ওপরের জল তোলপাড় হচ্ছিল। এবং আচমকা সব শান্ত হয়ে গেল। শুধু জলের রঙটা লালচে হয়ে উঠল কিছুটা জায়গা নিয়ে।

সায়ন দেখল একজন অশ্বারোহী ঘোড়াটাকে নদীর পাড়ে রেখে একটা বিরাট বড় প্যাকেট নিয়ে নদীতে নেমে হেঁটে পার হচ্ছিল···

স্তম্ভিত হয়ে দৃশ্যটা দেখল সায়ন। অত বড় জলপ্রবাহে কোথাও অশ্বারোহীর চিহ্নমাত্র নেই। একটু আগে একটি মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে শাসন করছিল, এই মুহূর্তে তা কিছুতেই বোঝা যাবে না। যেমন শান্ত ছিল নদীর ভঙ্গি এখন তেমনই আছে। নদীতে যে প্রাণীটি আছে সে তার আহার নিয়ে কোথায় চলে গেছে তা ওপর থেকে বোঝা যাবে না। পাখিরা ডাকছিল আবার। নিঃশব্দে প্রাকৃতিক নিয়মে যে-কাণ্ডটা ঘটে গেল তার সাক্ষী হয়ে রইল সায়ন এবং ঘোড়াটা। একটু পরেই তার বোধ ফিরে এলো। ঘোড়াটা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল সায়ন। সে জানে না কেন কাঁদছে। কিন্তু এমন মৃত্যু সে সহ্য করতে পারছিল না। ঘোড়াটাও ফোঁস ফোঁস শব্দ করে উঠল। তারপর বন্ধুর মতো সায়নের গলায় মুখ ঘষতে লাগল।

খুব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়াটা। সায়ন ওকে টেনে নদীর কাছে নিয়ে এলো। এই মাঝারি জলপ্রবাহে সেই হিংস্র প্রাণীটি তার খাবার নিয়ে নিশ্চিন্তে রয়েছে। ওপরে দাঁড়িয়ে তার অস্তিত্ব বোঝার উপায় নেই। যখন প্রাণীটি তাড়া করে এসেছিল তখনও স্পষ্ট দেখতে পায় নি সায়ন। ওটা কুমির নয়। কোনোও বড় মাছ কি এইভাবে আক্রমণ করে? হঠাৎ সেই ছবির দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শান্ত সমুদ্রের সৈকত। কত মানুষ নিশ্চিন্তে স্নান করছে, রোদ পোহাচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার। সমুদ্রের জলে সামান্য আলোড়ন তুলে একটি মানুষ তার রক্ত জলে ছড়িয়ে দিয়ে হারিয়ে গেল কোথায়।

সায়ন দেখল যে বস্তাটা নিয়ে অশ্বারোহী নদী অতিক্রম করেছিল সেটা পড়ে আছে সামনে। দু'হাতে টেনেও সে বেশিদূরে সরাতে পারল না ওটাকে। তারপর কৌতূহলী হয়ে বস্তার মুখ খুলে চমকে গেল। ছোট-ছোট পিজবোর্ডের বাক্সে ঠাসা বস্তাটা। অশ্বারোহীর যদি সভ্যতার সঙ্গে কোনোও সম্পর্ক না থাকে তা হলে এগুলো আসছে কোত্থেকে। কাল যে

মানুষগুলোকে সে দেখেছে, যে বৃদ্ধা তার উপকার করেছে, সেই মানুষগুলোর সঙ্গে অশ্বারোহীদের কোনোও সম্পর্ক নেই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেই মানুষগুলো হয়তো সভ্য পৃথিবীর খবর জানে না, কিন্তু অশ্বারোহীরা জানে। ওরা এদের ভয় দেখিয়ে বশ করে রেখেছে এবং সেই কাজে সহযোগিতা করছেন সুধাময় সেন। একটা পিজবোর্ডের বাক্স খুলতেই ঘড়ি দেখতে পেল সায়ন। অনেক ঘড়ি। নরম রোদের ছোঁয়া পেয়ে ঝকঝক করছে। ঘড়িগুলোর গায়ে বিদেশী নাম দেখতে পেল সে। সাযন অনুমান করল এই মানুষগুলো কোনোও চোরাচালানচক্রের সঙ্গে জড়িত। নিরাপদে কাজ করবে বলে ভুটানের এই দুর্গম এবং নির্জন পাহাড় বেছে নিয়েছে ওরা। সুধাময় সেন হয়তো এদের নেতা কিংবা ওইরকম কিছু। সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যাপারটার সঙ্গে যার কোনোও মিল নেই।

বস্তাটাকে সেখানেই ফেলে রাখতে গিয়ে ও মত পালটাল। অশ্বারোহীর দেরি হচ্ছে দেখে ওরা যদি কেউ খুঁজতে আসে তা হলে বস্তাটা নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। হয়তো ওরা বুঝতে পারবে কী হয়েছিল। এই ঘড়ি এবং অন্যান্য প্যাকেটগুলো যে স্বাভাবিক নয় এটা সে বুঝতে পারছিল। খুব স্বচ্ছন্দে দুটো মানুষকে ওরা খুনও করতে পারল এর জন্যে। সায়ন কোনোওরকমে বস্তাটাকে নদীর মধ্যে ঠেলে দিল। পড়ার সময় কিছু বাক্স হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপর আধডোবা নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে ছুটে গেল নীচের দিকে। বস্তাবন্দী হয়ে বাকিগুলো ডুবে গেল জলে। ওপরে দাঁড়িয়ে তার আর কোনোও হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না।

ঘোড়াটা আজও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সায়ন ওর গলায় হাত বোলাতে ঘোড়াটা আরামদায়ক একটা শব্দ নাক দিয়ে প্রকাশ করল। এই ঘোড়াটারও কোনোও জিন নেই। তবে দুটো রেকাব একটা স্ট্র্যাপের দুই প্রান্তে বেঁধে পিঠের ওপর দিয়ে দু'পাশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোড়াটার পিঠ এবং পেট আর একটা স্ট্র্যাপে বাঁধা। রেকাবের স্ট্র্যাপটা সেটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় স্থানচ্যুত হবার ভয় নেই। সায়ন লাগামটাকে ধরে ঘোড়া-

টাকে লক্ষ্য করল। ওর পিঠে উঠলে প্রতিবাদ করবে না তো! পাগলের মতো ছুটে তাকে অন্যান্য অশ্বারোহীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না তো! সেরকম ঘটলে আর বাঁচার আশা থাকবে না।

সায়ন দুরুদুরু বুকে রেকাবে পা রেখে ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসতে সেটা চারপায়ে সামান্য নাচল, নেচে স্থির হলো। এবং তখনই সায়ন বুঝল এটা বেয়াড়াপনা করবে না। সঙ্গে-সঙ্গে তার সমস্ত শরীর ও মনে একটা আরাম ছড়িয়ে পড়ল। কতক্ষণ বাদে সে এইভাবে পা ছড়িয়ে বসতে পারল। কিন্তু আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি এই এলাকাটা ছেড়ে যেতে পারে তত মঙ্গল। এখন দিব্যি রোদ উঠে গেছে। রঙ পালটেছে তার। যদিও ঘন পাতার আড়ালে বনের মাটি অনেকটাই ঢাকা কিন্তু নদীর দিকে তাকালে তো বোঝা যায়। সায়ন ঘোড়াটাকে সামনে চলার ইঙ্গিত করতে সে বাধ্য ছেলের মতো এগিয়ে চলল। এই পথে কোনোও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক পায়ে হাঁটা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘোড়াটার কোনোও অসুবিধে হচ্ছিল না। সে দিব্যি নদীর গা বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল নীচের দিকে। সায়নের মনে হলো, এটাই সঠিক পথ। এই নদী ধরে এগিয়ে গেলে সে কোনোও না কোনোও সময়ে সেই জায়গাটা দেখতে পাবে, যেখান দিয়ে তারা আসার সময় নদীটাকে অতিক্রম করেছিল। এখন মাথার ওপরে নেমে-আসা বুনো লতাপাতায় তার শরীর ছড়ে যাচ্ছে কিন্তু সে নিচু হয়ে ঘোড়াটার শরীর আঁকড়ে ধরে সেগুলোকে এড়াতে চাইছিল। তার কানে এখন নদীব স্রোতের শব্দ ছাড়া কোনোও আওয়াজ নেই।

হঠাৎ ঘোড়াটা স্থির হয়ে গেল। সতর্ক চোখে ডান পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল। তারপর তড়বড়িয়ে ছুটতে লাগল সামনে। যেন ভূতে তাড়া করেছে এমন ভঙ্গি তার। প্রাণপণে লাগামটাকে আঁকড়ে অনিবার্য পতন সামলাল সায়ন। তখনই তার চোখে পড়ল।

নদী এখানে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে গেছে। কিছুটা জল নদীর শরীর থেকে আচমকা বের হয়ে স্থির হয়ে আছে চারপাশে বালি নিয়ে।

দু'হাতে শক্ত করে লাগামটাকে টেনে ঘোড়াটাকে স্থির করতে পারল সায়ন। তারপর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওপরের দিকে তাকাল। সেই দড়ির সিঁড়িটাকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল। সুধাময় সেন কি ফিরে এসেছেন ইতিমধ্যে ? তিনি কি এখন তাঁর গুহায় অপেক্ষা করছেন প্রিয় হনুমানকে নিয়ে ! কোনোও মানুষের উপস্থিতি সে বুঝতে পারল না। এ-পথে সামনে এগোতে গেলে জলে নামতেই হবে। নদী কত গভীর বোঝা যাচ্ছে না। আর সেই হিংস্র প্রাণীটি যদি কাছাকাছি থাকে তা হলে ঘোড়াটা কখনওই জলে নামবে না। অথচ সামনে যদি যেতেই হয়, তা হলে নদীতে নামতে হবে। এবং সে-ক্ষেত্রে ওপরে যদি সুধাময় সেন থাকেন তা হলে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাবেন। অনেক ভেবেচিন্তে পথ পরিবর্তনের কথা ভাবল সে। নদী ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে কোনোওরকমে ঘোড়াটাকে ঢোকাতে পারল সায়ন। বুনো লতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে জঙ্গলটাকে। তার মধ্যে দিয়ে যেতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল ঘোড়াটার। আশেপাশে ভিতু জন্তুদের ছুটে যাওয়ার শব্দ হচ্ছিল। তখনই সায়নের পেতে-রাখা ফাঁদগুলোর কথা মনে পড়ল। সুধাময় সেনের শিকার সংগ্রহের ফাঁদে যদি ঘোড়াটা পড়ে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না। অথচ কিছুই করবার নেই তার। ফাঁদগুলোকে ওপর থেকে চেনা মুশকিল। কিছুদূর যাওয়ার পর সেই পাকা কলার কাঁদিগুলো চোখে পড়তেই সায়নের সমস্ত শরীরে খিদে চনমন করে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চেপেই সে একটার পর একটা কলা ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে খেতে লাগল। সুস্বাদু ফল তার খুব ভালো লাগছিল। আর এইসময় ঘোড়াটাও পরম আনন্দে পাতায় মুখ রাখল। বেশ কিছুটা সময় পার হলে সায়নের আরাম এবং ক্লান্তি বোধ হলো। যেন একটু হাত-পা ছড়িয়ে শুতে পারলে সে বেঁচে যেত। চোখ ঘুমে কেবলই বুজে আসছে। অথচ, এখন এই জঙ্গলে ঘোড়াটার পিঠ থেকে নামা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বন্যজন্তুর হাত থেকে ঘোড়াটা তাকে বাঁচাবে।

শেষ পর্যন্ত সায়ন আর পারল না। ঘোড়াটা যখন হাঁটে তখন তার পিঠে

াসে থাকা মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। ঘুম তখন আসতে পারে না। সে আরও একটু জঙ্গলের গভীরে চলে এলো। এখানে মাথার ওপর এত ঘন পাতার আচ্ছাদন যে চট করে হদিস পাওয়া মুশকিল হবে কারও। লাগামটাকে সে একটা গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে বাখল, যাতে ইচ্ছে হলেই সহজে খুলতে পারে। কিন্তু ঘোড়াটা স্থান ত্যাগ করতে পারবে না। ঘোড়াটাও নিশ্চয়ই ক্লান্ত ছিল। কারণ, সে পরমানন্দে খেয়ে যেতে লাগল বুনো ঘাস এবং মিষ্টি পাতা। দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল সায়ন। এভাবে সে কখনও শোয় নি, কিন্তু শরীরে এত ক্লান্তি যে ঘুম এসে গেল কিছু বোঝবার আগেই।

কতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে জানা নেই। কিন্তু মাটিতে ধপ করে পড়ে যেতে সায়নের চৈতন্য হলো। ঘোড়াটা প্রচণ্ড ছটফট করছে। সামনের দু'পা তুলে লাফাতে চেষ্টা করছে। প্রাণপণে ছুটে যেতে চাইছে কিন্তু বাঁধন থাকায় বেচারা নড়তে পাবছে না। ঘুমের চটক ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েই সায়ন পাথর হয়ে গেল। হাত-চারেক দূরে কুচকুচে কালো একটা সাপ চার-পাঁচ হাত উঁচু হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে। তার চোখ ঘোড়াটার দিকে। এত বড় ফণা কখনও ছাখে নি সে। অন্তত হাত-সাতেক লম্বা সাপটা। কিলবিলে অনুভূতি নিয়ে যেন কালো আলোর জেল্লা বের হচ্ছে ওর শরীর থেকে। সরু ফিনফিনে জিভ দু-তিনবার বাইরে বেরিয়ে এসে ভেতরে ঢুকে গেল। যে-কোনোও মুহূর্তে ছোবল মারবে সাপটা। এরকম বীভৎস প্রাণী কখনও ছাখে নি সে। তাদের বাড়ির লনে যে সাপ দুটোকে সে দেখেছিল, তারা এর কাছে নিতান্তই শিশু।

তারপরই সায়নের মনে হলো, সাপটা যেন একটু ঘাবড়েছে। ওর চোখ সায়নের দিকে আর ঘোড়ার দিকে সমান তালে ঘুরছে। ও বোধহয় সায়নের উপস্থিতি আগে লক্ষ্য করে নি। এই মুহূর্তে প্রথমে কাকে আক্রমণ করবে বুঝতে পারছিল না। ঘোড়াটা এখন একদম স্থির হয়ে গেছে। বোধহয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে সে পাথর হয়ে পড়েছিল। আর তখনই

পায়ের শব্দ উঠল। জঙ্গল মাড়াতে-মাড়াতে কারা যেন ছুটে আসছে। সাপটা আবার বিভ্রান্ত হলো। হয়তো সে নিজের বিপদ অনুমান করল। তারপর ফণা নামিয়ে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেদিকে সড়াৎ করে অবলীলায় চলে গেল লম্বা শরীরটা নিয়ে। সম্বিৎ ফিরতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল সায়নের। ঘোড়াটা তখনও নড়ছে না। নিজের শরীরে কোনোও সাড় আছে বলে বোধ হচ্ছিল না সায়নের। সে ঘোড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই একটা পরিত্রাহি চিৎকারে জঙ্গলটা কেঁপে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে গুড়ুম করে একটা শব্দ হলো। এত কাছাকাছি বন্দুকের আওয়াজ হতেই সচকিত হলো সায়ন। আর ঘোড়াটা ছটফটিয়ে উঠল। প্রাণপণে ওর মুখ জাপটে ধরে শান্ত করতে চেষ্টা করল সায়ন। বন্দুক এবং মানুষের চিৎকার মানেই আর-এক ধরনের বিপদ। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার পায়ের আওয়াজ হলো। এবার চিনতে পারল সে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে গেল জঙ্গল মাড়িয়ে।

আবার সব শান্ত হয়ে গেলে সায়ন ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসে ফাঁসটা খুলে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল মূল পথটার দিকে। আড়াল সরিয়ে কিছুটা যেতেই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বুনো ঘাসের ওপর দিয়ে যে পায়ে-চলা পথ, তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি মানুষ। দুটো হাত সামনের দিকে ছড়ানো। আর মানুষটার শরীরের পাশে নেতিয়ে আছে সাপটা। বোঝা যাচ্ছে গুলির যে শব্দটা হয়েছিল সেইটে ওর মাথা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখনও তার লেজটা নড়ছে, নড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো সায়নের কাছে। অশ্বারোহীর দলটা এদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। সাপটা এই লোকটাকে আক্রমণ করে চিৎকার হওয়ামাত্র ওর বন্ধুরা সাপটাকে গুলি করে মেরে ফেলে। এবং মৃত সহকর্মীর ওপরে সামান্য সহানুভূতি না জানিয়ে ওরা তাকে এখানে ফেলে চলে যায় নিজেদের কাজে। মানুষগুলো কতটা নির্মম তা আর আন্দাজ করতে পারছিল না সায়ন। তবে সাপটার বিষের প্রতিক্রিয়া যে

কতখানি তা বুঝে শিউরে উঠল সে। কে যেন একবার তাকে বলেছিল, সাপ কামড়ালে অন্তত আধঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সাপটা দু-তিন মিনিটের বেশি সময় দেয় নি।

ধীরে ধীরে আলো কমে আসছিল। সময় আন্দাজ করা জঙ্গলের ভেতরে বেশ মুশকিল। ঘুমিয়ে নিয়ে সায়নের বেশ তাজা লাগছিল শরীর। হঠাৎ তার কৌতূহল হলো। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটার কাছে এগিয়ে গেল সে। এর মধ্যে শরীর নীল হতে শুরু করেছে। কোনোওরকমে চিত করে শুইয়ে দিতেই ন্যাড়া মাথাটা দেখতে পেল। লোকটাও নিশ্চয়ই ওর বন্ধুদের মতো নির্মম ছিল। এবং তখনই তার নজরে পড়ল ওর কোমরে গোঁজা রিভলভারের খাপটা। একটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা আছে। সায়ন কোনোও কিছু চিন্তা না করে দ্রুত কোনোওরকমে বেল্টটা খুলে নিল। কোনোওদিন রিভলভার চালায় নি সে। কিন্তু বেল্টের সঙ্গে বাঁধা খাপে গোটা-ছয়েক গুলি আছে। আর এই জঙ্গলে মৃত্যু তো যেখানে-সেখানে। কোমরে রিভলভারসুদ্ধ বেল্টটাকে বেঁধে সে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটার ওপরে। সন্ধের আগেই একটা ফাঁকা জায়গায় যাওয়া দরকার তার।

বারংবার রিভলভারের দিকে মন চলে যাচ্ছে। এর ভেতরে গুলি আছে কি না কিংবা ছোঁড়বার সময় ঠিক কী কী কাজ করতে হয় সায়ন জানে না। সিনেমায় সে দেখেছে কীভাবে গুলি ছোঁড়া হয়। ওই ট্রিগারটায় চাপ দিলেই কি গুলি বের হবে? জিনিসটা যার সে কি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি করে রেখেছিল? একটু দাঁড়িয়ে যন্ত্রটাকে ভালো করে দেখে নিল সে। খুলতে সাহস হচ্ছিল না। একবার ট্রিগার টিপে পরীক্ষা যে করে নেবে তারও উপায় নেই! যদি সতি-সত্যি গুলি বের হয়, তা হলে যে আওয়াজ হবে তাতে তাকে খুঁজে বের করতে ওদের কোনোও অসুবিধে হবে না! অতএব অস্ত্রটাকে হাতে পাওয়ার পরও আর এক ধরনের অসহায়তা ক্রমশ আচ্ছন্ন করছিল সায়নকে।

ঘোড়াটা চলছে তুলকি চালে। মাথার ওপর ঘন ডালপাতার আড়াল। খুব দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। সায়ন বুঝতে পারছিল তারা অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। নদীর জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ জঙ্গল পাতলা হয়ে গেল। শুকনো পাথুরে একটা উপত্যকা চোখে পড়তেই সে ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। এখনও যে আলোটুকু পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে তাতে তাদের স্পষ্ট দেখা যাবে আর-একটু এগিয়ে গেলে। কেউ তাকে লক্ষ্য করবে কি না জানা নেই, কিন্তু সাবধান হতে দোষ কী! সে তাকিয়ে দেখল এই বিশাল বন ক্রমশ নীচে নেমে গেছে। আকাশ এখানে অনেক বড়। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুধু জঙ্গল এবং শেষমেশ সবুজে-কালোয় মেশামেশি। সায়ন বুঝতে পারছিল না কোথায় পৌঁছনো যাবে ওই ঢালু দিক দিয়ে নেমে গেলে।

একসময় রবার দিয়ে মুছে ফেলার মতো দিনের আলো ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। যদিও আকাশে তারারা চটপটে পায়ে জায়গা নিয়ে নেওয়ায় আর-এক রকমের আলো নামল চরাচরে, কিন্তু অন্ধকারের গা-ছমছমে ভাবটা যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। বেশ কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসছে উলটো দিক দিয়ে। সেই শব্দে সায়নের ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে পা ঠুকতে শুরু করল। ন্যাড়ামাথা লোক-গুলো এদিকে কেন আসছে ঠাহর করতে না পেরে সে জঙ্গলের মধ্যে আর-একটু সরে এলো। এবং তখনই ভয় হলো, ওরা নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব বুঝতে পেরেছে। নিশ্চয়ই সারা দিন খুঁজেছে ওরা। সুধাময় সেন কি নির্দেশ দেন নি তাকে খুঁজে বের করতে? এই জঙ্গল তো ওদের চেনা. কিন্তু তার হদিস পেতে এত দেরি হলো কেন? যাই হোক, সে সহজে ধরা দেবে না ওই শয়তানদের হাতে। দুটো মানুষকে যেভাবে খুন করেছে ওরা, তাতে নিজের অবস্থা ধরা পড়লে কী হবে বুঝতে বাকি নেই। সায়ন ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা একটা গাছের ডালে বেঁধে ঘোড়াটার পিঠে হাত রাখতেই সে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

সায়ন আর দেরি না করে দ্রুত জায়গা ছেড়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। পায়ের তলায় শুকনো পাতা মচমচিয়ে ভাঙছে। অন্ধকারে একটা ঝাঁকড়া শক্ত গাছে উঠে বসতেই সে পরিষ্কার দেখতে পেল। পাতলা অন্ধকারের চাদর ভেদ করে চারটে ঘোড়সওয়ার এসে দাঁড়িয়েছে পাথুরে উপত্যকায়। সাযন আশ্বস্ত হলো, ওরা কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে না। বরং ঘোড়া থেকে নেমে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে জঙ্গলের পাশে রাখা স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল। সায়ন লক্ষ্য করল সেগুলো কাঠ নয়, পাথর নয়, খুব ভারী কিছু নয়। চারটে লোক নিঃশব্দে সেগুলো বয়ে এনে একটি জায়গায় সাজাতে আরম্ভ করল। ওরা কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করছে না। এমন কী, তাদের ঘোড়াগুলোও অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সায়ন বুঝতে পারছিল না ওরা কী করছে। চারজনের একজন কাজ শেষ হলে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ঘোড়ার শরীরে ঝুলিয়ে-রাখা পাত্র এনে সাজানো জায়গায় ছড়িয়ে দিল। এবার দ্বিতীয়জন খুব সন্তর্পণে দেশলাই জ্বেলে দিল সেখানে। মুহূর্তেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল জায়গাটা। সায়ন সেই আগুনের আলোয় দেখল শকুনের মতো ন্যাড়ামাথা চারটে মানুষ হিংস্র চোখে সেই আগুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তারপর এক মুহূর্তেই ঘোড়াগুলো মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আগুনটা বাড়ছে। তার তাপ টের পাচ্ছিল সায়ন। পাখিরা এর মধ্যেই চেঁচামেচি করে আশপাশের গাছ থেকে উড়ে গেছে। উঁচু গাছের মাথায় উঠে এসেছে আগুনের শিখা। এবং তখনই সায়নের খেয়াল হলো। নির্দিষ্ট জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর সেটাকে ইংরেজি 'টি' অক্ষরের মতো দেখাচ্ছে। একটা দাঁড়ির ওপর লম্বা ছাদ। চকিতে মনের মধ্যে বুধুয়া-বুড়োর সন্ত্রস্ত মুখ ভেসে উঠল। এই আগুনটাকেই বুধুয়া-বুড়ো শয়তানের নির্দেশ বলে মনে করত। টি অক্ষরের মানেটা বুধুয়া-বুড়ো বলেছিল, ভগবান আসছে, পালাও। বুড়োর ভীত মুখটা মনে করে হেসে ফেলল সে। বুধুয়া যাকে শয়তানের নির্দেশ বলে মনে করত তাদের সে দেখতে

পেয়েছে। কিন্তু ভগবান আসছে পালাও—এ নির্দেশ কী কারণে ? কে ভগবান ? আর এই নির্দেশই বা দেওয়া হচ্ছে কাকে ? কিন্তু পাহাড়ের এই উঁচু এবং ন্যাড়া জায়গায় আগুন জ্বেলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর এই আগুন তাদের চা-বাগানের বাংলোয় দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় তখন দূরত্বটা নিশ্চয়ই খুব বেশি নয়। তার মনে হলো, এই সময়েও বুধুয়া-বুড়ো আগুনটা দেখে শিউরে উঠছে। কিন্তু যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করার সেটা হলো দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনের শিখাটা নেমে আসছে না। শুধু কাঠ হলে এমনটা হতো না। ওরা যেটা মিশিয়েছে সেটা পেট্রল কিংবা স্পিরিটজাতীয় কিছু এবং মিশেছে রবার বা ফোমে। কারণ বিশ্রী পোড়া গন্ধ লাগছে নাকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর আগুন কমে এলো। পাথরের ওপর ধিকি-ধিকি জ্বলছে সেটা। যেন একটা টি শুয়ে আছে। সায়ন নেমে এলো গাছ থেকে। তারপর সন্তর্পণে ঘোড়াটার পাশে এসে দাঁড়াল। এবং তখনই সে চমকে উঠল। ঘোড়াটা শুয়ে আছে। ঠিক শোওয়া বললে ভুল হবে। ওর মুখ গলা দড়িতে আটকানো বলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। পেছনের জোড়া পা ভাঁজ করা অবস্থায় শরীরটা মাটিতে গড়াচ্ছে। এক পলকেই সায়ন বুঝতে পারল, প্রাণীটা মৃত। দৌড়ে সরে এলো সে। কে ওকে মারল। সে স্পষ্ট দেখেছে চার ঘোড়সওয়ার এদিকে মোটেই আসে নি। তা ছাড়া ওরা নিজেদের ঘোড়াটাকে এমনভাবে মারবে না। এই পাহাড়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত দামি পশু। মরে যাওয়ার সময় ঘোড়াটা সামান্য চিৎকারও করে নি। এমন নিঃশব্দে কেন মরে গেল ঘোড়াটা। তারপরেই সায়নের মনে হলো ওকে সাপে কামড়ায় নি তো ? তা হলে সে এমন সাপ যার বিষে একটা ঘোড়াও নিঃশব্দে মরে যায়। সায়নের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ছটফটিয়ে উঠল। ভাগ্যিস সে ঘোড়াটার পিঠে ছিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হলো ঘোড়াটা যদি সামান্য শব্দ করে মরত তা হলে অশ্বারোহীরা টের পেয়ে যেত সে এখানে এসেছে। মৃত্যুর সময়েও ঘোড়াটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে

গল।

এই জঙ্গলে যে বিষধর সাপ আছে তার প্রমাণ আগেই পাওয়া গেছে। কিন্তু তারা যে এমন মারাত্মক বুঝতে পারে নি। সাপ ছাড়া এভাবে চোরের মতো কেউ মৃত্যুকে ডাকতে পারে না। আতঙ্কিত সায়ন প্রায় নিভে-আসা আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল। রবারজাতীয় কিছুতে পেট্রল ঢেলেছে বোধহয়। গন্ধ এত তীব্র যে সামনে দাঁড়ানো কষ্টকর। তবু এই জায়গাটা নিরাপদ। অন্তত সাপ আগুনকে ভয় পায়। কিন্তু ওরা যদি আগুনের ওপর নজর রাখে, তা হলে তো তাকেও দেখতে পারে। সায়ন আর কিছুই ভাবতে পারছিল না। শরীরে এবং মনে সে প্রচণ্ড ক্লান্ত। এখন যা হয় হোক, সে ওই অন্ধকার জঙ্গলে একা পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না। ধিকিধিকি আগুনের কাছাকাছি পরিষ্কার জায়গা দেখে সে পাথরের ওপর বসে পড়ল। তাত লাগছে, কিন্তু সেটা বেশ আরামপ্রদ। মাথার ওপর আকাশভর্তি তারা। ওরা যেন ক্রমশ বেঁকে পায়ের তলায় নেমে গেছে। উৎকট গন্ধ ক্রমশ অভ্যাসে এসে গেলে সহনীয় হয়। সায়নের সেদিকে খেয়াল ছিল না। সুধাময় সেন কি তাঁর দলবল নিয়ে এই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে চান। ওরা নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে, নইলে পালাবার কথা বলত না। কিন্তু সে কী করে চা-বাগানে ফিরে যাবে? বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোনোও পথই তো তার জানা নেই।

একগাদা পাখি একসঙ্গে ডাকলে মাছের বাজারকেও হার মানিয়ে দেয়। সায়ন ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, পাতলা আলো ছড়িয়েছে জঙ্গলের ওপর, পাহাড়ের গায়ে। আর আশপাশের গাছে দল বেঁধে ঝগড়া করছে ভোরের পাখিরা। সামনে জমে-থাকা ছাইগুলো এখনও টি অক্ষরটিকে ধরে রেখেছে। অসাড়ে ঘুমিয়েছে সে, কখন রাতটা ফুরিয়েছে টের পায় নি। ঘুমটা তার উপকার করেছে, কারণ খিদে ছাড়া অন্য কোনোও ক্লান্তি নেই শরীরে। চটপট সে খোলা জায়গা ছেড়ে জঙ্গলের মধ্যে সরে পড়ল। এতক্ষণ যে কেউ তাকে দেখতে পায় নি এই রক্ষে! সায়ন সন্তর্পণে কয়েক

পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘোড়াটা নেই। অথচ দড়ির প্রান্তটা ছেঁড়া অবস্থায় ঝুলছে গাছের ডালে। আর ওখান থেকে কোনোও ভারী জিনিস টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে ওপাশে। সায়ন আর দাঁড়াল না। কোনোও বড় জানোয়ার ঘোড়াটাকে খেয়েছে। সেই জানোয়ার ঘুমন্ত অবস্থায় তাকেও খেতে পারত।

সায়ন প্রাণপণে, যতটা সম্ভব জঙ্গলে দৌড়নো যায় ততটা দৌড়ে জায়গাটা ছেড়ে পালাতে চাইল। নিশ্চয়ই ওই ভারী ঘোড়াটাকে নিয়ে জানোয়ারটা বেশি দূর যায় নি, যেতে পারে না। এই সময় হঠাৎ চোখ তুলে সামনে তাকাতেই তার দুটো পা জমে গেল। জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে খাড়া পাথুরে পাহাড় উঠে গেছে। সেই পাহাড়ের চুড়োটা খুব বেশি উঁচু নয়। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, চুড়োটায় চাতাল আছে। কিছুক্ষণ তাকানোর পর সায়নের স্পষ্ট মনে হলো ওটাই সুধাময় সেনের আস্তানা। ওখানেই সে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু কোনোও মানুষকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুধাময় সেন তাকে যে-দিকটায় যেতে নিষেধ করেছিলেন, সেটাই কি এই দিক? অগ্নি-সংকেত পাঠানো হয় এই দিক থেকে বলেই কি সুধাময় সেন আড়াল করতে চেয়েছিলেন?

যত কাছে এগোতে লাগল সায়ন, তত জলের শব্দ কানে আসতে লাগল। এই শব্দ তাকে আরও নিশ্চিত করল জায়গাটা সম্পর্কে। এখন আর চাতালটাকে দেখা যাচ্ছে না। অনেক নীচে নেমে এসেছে সে। ওপরে কেউ আছে কি না তাও জানা নেই। কিন্তু এই জঙ্গল ভেদ করে নদীর দিকে যাওয়াটাও মুশকিল।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক পরে সায়ন সেখানে পৌঁছল যেখানে নদীর জল কিছুটা ঢুকে বালির মধ্যে মুখ গুঁজেছে। সায়ন চিনতে পারল। ওখানেই সে প্রথম দিন বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল এবং সুধাময় সেন তাকে উদ্ধার করে-ছিলেন। একটা গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। একমাত্র পাখির ডাক আর জলের শব্দ ছাড়া কোনোও আওয়াজ নেই। সায়ন

লক্ষ্য করল, সেই দড়িটাকে দেখা যায় কি না। এখান থেকে ঠাহর করা মুশকিল। ওই চাতাল এবং গুহা সায়নকে টানছিল। ওখানে গেলে খাবার পাওয়া যাবে, এ-কথা ঠিক, কিন্তু আর একটা জিনিস তাকে আকর্ষণ করছিল। অন্যের ডায়েরি পড়া উচিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুধাময় সেনের ডায়েরিটা তার জানা দরকার। ওটা না জানলে সুধাময় সেনের সম্পর্কে সে কোনোও কথাই চা-বাগানে ফিরে গিয়ে বলতে পারবে না। যদি সুধাময় সেন এখন ওখানে থাকেন তা হলে! এক ধরনের জেদ ওর মনে শেকড় গাড়ল। উলটে সে-ই অভিযোগ করতে পারে, তাকে ফেলে রেখে তিনি কেন চলে এলেন? মুখোমুখি নিশ্চয়ই সুধাময় সেন তাকে খুন করতে পারবেন না। আর সেরকম চেষ্টা করলে তার সঙ্গেও অস্ত্র আছে।

কোনোও মানুষের অস্তিত্ব না পেয়ে সে ধীরে ধীরে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো এবং তখনই দেখতে পেল বালির ওপর অনেক জুতোর দাগ। দাগগুলো বেশ টাটকা। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। ন্যাড়ামাথা ঘোড়-সওয়াররা কি এখানে এসেছে? কিন্তু কোনোও ঘোড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না তো। সে ধীরে ধীরে পাহাড়টার নীচে পৌঁছে উপরের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। নিঃশব্দে হনুমানটা তাকে দেখছে। তারপর চোখাচোখি হতেই সেটা লাফিয়ে উপরে উঠে গেল।

দ্রুত সরে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সায়ন। ওপর থেকে দড়িটা নেমে আসছে সরসর করে। ওই দড়ি না বেয়ে উঠলে চাতালে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। আর দড়ির পাক ছাড়ছে হনুমানটা। সুধাময় সেন ধারে-কাছে নেই। ছুটে এসে দড়িটাকে ধরে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সায়ন।

পায়ে পায়ে দড়িটা ধরে ওপরে উঠে এলো সায়ন। সবসময় তার নজর ওপরের দিকে ছিল। সেখানে হনুমানটাই বসে আছে গম্ভীর মুখে। দ্বিতীয়

কোনোও প্রাণীকে সঙ্গী না করে সে সায়নকে দেখে যাচ্ছে। সুধাময় সেন আছেন কি না টের পাওয়া যাচ্ছে না।

ওপরে ওঠামাত্র হনুমানটা দক্ষ হাতে দাড়িটা টেনে তুলতে লাগল ওপরে। সায়ন আশ্বস্ত হলো এই কারণে, মানুষের মতো পশুদের মনে শত্রুতা সংক্রামিত হয় না সহজে। তার প্রভু কী করেছে হনুমানটার জানার প্রয়োজন নেই। সে পুরনো অভ্যেসমতো কাজ করে যাচ্ছে। সায়ন চটপট গুহার সামনে চলে এলো। সুধাময় সেন সত্যিই নেই। শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। গুহার ভেতর উঁকি মারতেই সন্দেহ হলো। সায়ন গুটিগুটি ভেতরে ঢুকেই বুঝতে পারল। সুধাময় সেনের কোনোও জিনিসপত্র এখানে নেই। সেই ঝোলানো ব্যাগ কিংবা টুকিটাকি উধাও। অর্থাৎ সুধাময় সেন এই আস্তানায় আর নেই।

যে মানুষটাকে এতক্ষণ সে শত্রু ভাবছিল, তার অনুপস্থিতি চকিতে সায়নকে অসহায় করে তুলল। এই পাহাড়, ঘন জঙ্গলে সে এখন সত্যি-কারের একা। ফিরে যাওয়ার যেটুকু সুযোগ ছিল সেটুকু যেন চোখের সামনে থেকে সরে গেল। গত রাতের অগ্নি-সংকেতের কথা মনে পড়ল। পালাতে বলেছিলেন। সেই পালানোর মধ্যে সুধাময় নিজেও যে থাকবেন তা সে কী করে জানবে!

সায়ন ভারী পায়ে বেরিয়ে চারপাশে তাকাল। ভোরের রোদ-মাখা জঙ্গল এখন হাওয়ায় কাঁপছে। সে ধীরে-ধীরে সেই দিকটায় চলে এলো, যে-দিকে যেতে সুধাময়ের নিষেধ ছিল। এবং সেখান থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল। পাথুরে জমির ওপর কাল রাত্রে ওখানেই আগুন জ্বালানো হয়েছিল। এই অগ্নি-সংকেত থেকেই দূর-দূরান্তের মানুষ নিজের মতো করে অর্থ বুঝে নেয়। সুধাময় চাননি সায়ন এটা দেখুক।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে সায়ন হেসে ফেলল। হনুমানটা এক ছড়া কলা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সায়ন ওর মাথায় হাত বোলাতে বেচারা খুব খুশি হল। এবং তখন সায়নের মনে

গলো, মুখে-চোখে জল দেওয়া হয় নি। খিদেও পেয়েছে বেশ। সে চলে এলো আবার গুহার ভেতরে। একেবারে শেষে সেই জল তোলার ব্যবস্থাটা এখনও আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গুহার মুখে বসে হনুমানটার সঙ্গে কলাগুলো ভাগ করে খেল। চা-বাগানে মা যখন ব্রেকফাস্টে কলা খেতে দিতেন তখন মোটেই ভালো লাগত না। কিন্তু এই কলাগুলোর আলাদা স্বাদ, হয়তো এই জঙ্গলের বাইরে পাওয়া যায় না বলেই। খাওয়া শেষ করে সে হনুমানটার দিকে তাকাল। বেচারা কেমন করুণ চোখে তাকাচ্ছে। ও কি বুঝতে পেরেছে ওর মালিক ওকে ছেড়ে চলে গেছে? সায়নের খুব মায়া হলো। এই হনুমানটারও নিশ্চয়ই তার মতো কোনও সঙ্গী নেই। সে অত্যন্ত সাহসী হয়ে ধীরে-ধীরে হনুমানটার মাথায় হাত রাখল। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না প্রাণীটা। শেষ পর্যন্ত নীরবে খানিকটা আদর খেয়ে লাফ দিয়ে চলে গেল ওপাশে।

সমস্ত শরীরে ময়লা জমেছে। জামা-প্যান্টের চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না ওদের আসল রঙ কী ছিল! মা বলতেন, বেশি নোংরা হয়ে থাকলে চামড়ার রোগ হয়। চা-বাগানের অনেকের শরীরে সে-রকম দেখেছে সে। ব্যাপারটা ভাবতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল সায়ন। এই উঁচু পাহাড়ের গুহায় জল তুলে স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পারে, জামা-প্যান্ট জলকাচা করে নিতে পারে। যতদূর মনে হচ্ছে, সুধাময় সেন আর এই গুহায় ফিরে আসবেন না। এখানে থাকলে রোদ জল ঝড়ে আর কোনোও ক্ষতি হবে না। জঙ্গলে ফল আছে, বন্য পশু আছে, তাদের ধরার কায়দাটাও সে শিখেছে। অতএব কোনোও ভয় নেই। আর এই গুহায় সাপ ছাড়া কোনোও জন্তু উঠতে পারবে না। সাপের জন্যে তো হনুমানটা আছে। একটা অলস ভাবনা পেয়ে বসছিল যখন, তখন সম্বিৎ ফিরে পেল সায়ন। এ কী ভাবছে সে? এই গুহায় চিরজীবন থেকে যাবে নাকি? অসম্ভব। তাকে ফিরে যেতে হবেই।

সায়ন উঠে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে দু'বার শব্দ করতেই হনুমানটাকে দেখা

গেল। সায়ন বেশ মজা পেল। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে কেমন হয়? কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ইশারায় নীচের দিকটা দেখাল। হনুমানটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। তৃতীয়বারে সে বুঝতে পেরে দড়িটা নামাতে লাগল নীচে। সায়ন দেখল এই ব্যাপারটা ও বেশ পটু হাতে করছে। দড়ি নামানো হয়ে গেলে সায়ন চারপাশে তাকাল। হাওয়ার দাপট ছাপিয়ে নদীর শব্দ কানে এলো। বেশ জোরে স্রোত বইছে এখন। তার ওপাশে গভীর কালো জঙ্গল উঁচু-নিচু হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। এই জঙ্গল ছাড়িয়ে তাকে যেতে হবে। সুধাময় আর তাঁর শয়তানের দল নিশ্চয়ই সতর্ক চোখে সর্বত্র নজর রাখছেন। কিন্তু উপায় নেই, মরুক বাঁচুক, তাকে ফিরতেই হবে। সায়ন ইশারায় কাছে ডাকল হনুমানটাকে। তারপর দড়ি ধরে নীচে নামতে লাগল। কিছুদূর আসার পর মুখ তুলে সে দেখতে পেল হনুমানটাও সরসর করে নেমে আসছে। এবং ওই গতিতে নামলে ওটা নির্ঘাত তার মাথায় আছাড় খাবে। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই হনুমানটা আলতো পা তার কাঁধে রেখে সট্ করে নীচে নেমে গেল আর-একটা পাথর ধরে।

বালিতে দাঁড়িয়ে আর-একবার মাথা তুলে দেখল সায়ন। সত্যি একটা সুন্দর জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন সুধাময় সেন। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক হোন কিংবা না হোন, এই আস্তানাটা সত্যি নিরাপদ এবং ভালো। সায়ন এবার নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। জলে ঢেউ ভাঙছে আর ছুটছে। এখানেও সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটি আছে নাকি? একটি না একাধিক? যাকে দেখে ঘোড়া ভয় পায়, যে স্বচ্ছন্দে একটা মানুষকে নড়বার সুযোগ না দিয়ে তলায় টেনে নিয়ে যায়। অথচ, নদী পার না হয়ে তো চা-বাগানের দিকে যাওয়াও যাবে না। ঝিঁঝির শব্দ হচ্ছে এক-টানা। পাখি ডাকছে নানান স্বরে। হনুমানটার কথা মনে পড়ল সায়নের। ও কি আবার ফিরে গিয়েছে ওপরে? বেচারা নিশ্চয়ই আশা করছে সুধাময় সেন ফিরে আসবেন। সায়ন দু'পা ফিরে এলো। এবং তখনই সে

দেখতে পেল, একটা গাছের ডালে বসে আছে হনুমানটা সতর্ক চোখে তার দিকে তাকিয়ে। সায়ন হাসল। তারপর জিভে দু'বার শব্দ করতেই হনুমানটা লাফিয়ে নামল। সায়নকে অবাক করে এগিয়ে গেল সামনে। যেন পথ চিনিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল! সায়ন তাকে অনুসরণ করল। অবশ্য এ ছাড়া কোনোও পথ নেই। সে চাইছিল এমন একটা জায়গা, যেখানে স্রোত কম এবং জল হাঁটুর নীচে। তা হলেই সে পার হবার ঝুঁকি নিতে পারে। হনুমানটা মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। এই পথ খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। তাই চলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে সায়ন তাকে ডাকতেই সে আবার চলা শুরু করছিল। তবে পায়ে হাঁটার চেয়ে এখন সে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে যাওয়াই বেশি পছন্দ করছিল। শেষ পর্যন্ত জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল। পাথর দেখা যাচ্ছে জলের তলায়। হঠাৎ উঁচু জমি পাওয়ায় স্রোতটা থেমে গেছে। চওড়াও বেশি নয়। সায়ন খানিকক্ষণ পাড়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল, কিছু দেখা যায় কি না। কয়েকটা চুনোমাছের ঝাঁক ছাড়া কিছুই নজরে এলো না। জলের প্রাণীটা নিশ্চয়ই বেশ বড়। তার পক্ষে কি এত কম জলে আসা সম্ভব হবে? আর ওর যদি কোনোও সঙ্গী না থাকে তা হলে এতক্ষণ তো পেট ভর্তি হয়ে থাকার কথা। খিদে না পেলে আক্রমণ করবেই বা কেন? সায়ন হনুমানটাকে কাছে ডাকল। প্রাণীটা জলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিচিত্র শব্দ করে কিছুটা সরে দাঁড়াল। অর্থাৎ ও জলে নামতে চায় না। সায়নের মনে পড়ল ঘোড়াটার কথা। সেটাও এইরকম জলে নামতে চায় নি। বন্য জন্তুরা অনেক বেশি বুঝতে পারে! কিন্তু সাদা চোখে সায়ন তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটা বিশাল ঈগলজাতীয় পাখি একটা পাক দিয়ে কর্কশ গলায় ডেকে ওপাশের গাছে গিয়ে বসল। সায়ন হাত বাড়িয়ে হনুমানটাকে ডাকল। তার মনে হচ্ছিল ও সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। একা যাওয়ার চেয়ে চেনা প্রাণীর সঙ্গ সাহস বাড়াবে। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যে যে বন্ধুত্বটুকু হয়েছে তাতে কি এই

দাবি সে করতে পারে না? হনুমানটা নড়ল না। তখন সায়ন ওর কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। হনুমানটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। সায়ন ইশারায় নিজের কাঁধ দেখাতে সে কিছুক্ষণ সময় নিল। তারপর দোনামনা করে সায়নের কাঁধে চেপে বসল। শরীরের ওজন বেশ, কিন্তু হনুমানটা এমন কায়দা করে বসেছে যে, সায়নের অসুবিধে হলো না উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু এমন উৎকট গন্ধ বের হচ্ছে প্রাণী-টার শরীর থেকে যে, বমি হয়ে যাবার যোগাড়! জলে নামল সায়ন। চোরা স্রোত আছে, জল যতই কম হোক না কেন! তবু যতটা সম্ভব দ্রুত পা ফেলতে লাগল সে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে। জল দেখে হনুমানটা এমন ঘাবড়েছে যে, দু'হাতে তার মাথা আঁকড়ে ধরেছে, যাতে পড়ে না যায়।

জল পার হয়ে এলো সায়ন। বুকের ধকধকানিটা তখনও কমে নি। না, কোনোও আলোড়ন হয় নি জলে। এপারে এসে হনুমানটা কাঁধ ছেড়ে সরাসরি একটা গাছের ডাল ধরল লাফিয়ে। নিশ্চিন্তিতে যখন সায়ন নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই তার বুকে থম্ ধরল। পলকেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন। সামনেই একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা ন্যাড়া-মাথা। তার মুখের একটা কোণে ঘাসের ডগা বেরিয়ে আছে। অন্য প্রান্তটি নির্বিকার ভঙ্গিতে চিবিয়ে যাচ্ছে সে। চোখ স্থির। এবং সেই দৃষ্টিতে এমন বরফের স্পর্শ যে, শিউরে উঠল সায়ন। সে ধরা পড়ে গেছে। এখন আর পালাবার কোনোও পথ নেই। তখনই পেছনের জলে আলোড়ন উঠল। শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র পা ভারী হয়ে গেল। অর্থাৎ পিছনের নদীতে প্রাণীটি এসে গেছে ইতিমধ্যে। হনুমানটা চিৎকার করছে প্রাণপণে।

এবার ন্যাড়া-মাথা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ইশারা করল ওকে অনু-সরণ করতে। সায়ন বুঝতে পারছিল না কী করবে। সে জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ লোকটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে অজানা ভাষায় কিছু চিৎকার

করতেই তার সম্বিৎ ফিরল। সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে সে লোকটাকে অনুসরণ করল।

সায়ন বুঝতে পারছিল তার কী হতে যাচ্ছে। এই শয়তানগুলোর প্রাণে কোনোও দয়ামায়া নেই। দু-দুটো মানুষকে নির্দ্বিধায় খুন করেছে তারা। কিন্তু এই লোকটা কি একা? ওর সঙ্গীরা কোথায়? পেছন থেকেই বুঝতে পারল প্রচণ্ড শক্তি ধরে শয়তানটা। সমস্ত শরীরে এক ফোঁটা চর্বি নেই। লোকটা হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু একবারও পিছনে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ ও ধরেই নিয়েছে, তাকে অনুসরণ করা ছাড়া সায়নের কোনোও উপায় নেই। সায়ন কথাটা নিজেও বুঝতে পেরেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ সে শক্ত হয়ে গেল। বোকার মতো সে প্রাণ দেবে না। তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে!

পনেরো জোড়া শকুনের চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। সায়ন হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল একটি বৃত্তের মধ্যে। বৃত্তটি রচনা করেছে কালো পোশাক ন্যাড়া-মাথার মানুষগুলো। প্রত্যেকের চোয়ালের নীচে কিছু আছে: নড়ছে যখন তখন মনে হয় চিবোচ্ছে। যে লোকটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বৃত্তে মিশে গেল। এখন সায়ন ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার চারপাশে সবাই। জায়গাটা একটু ন্যাড়া ধরনের। গাছপালার মাঝ-খানে মানুষের টাকের মতো। সামান্যই। জঙ্গলের যাবতীয় শব্দাবলী বাজছে আবহসঙ্গীতের মতো। কেউ কোনোও কথা বলছে না, কিন্তু দৃষ্টিও সরছে না।

হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়াল। লোকটাকে সেই উৎসবের সময় দেখেছে সায়ন। নিরীহ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে এমন একটা চড় মারল আচম্বিতে যে, সায়নের মনে হলো পৃথিবীটা অন্ধকার, তার শরীর ওপরে উঠে যাচ্ছে এবং তারপরই মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। চেতনা যায় নি কিন্তু অস্বচ্ছ বোধের মধ্যে সায়ন চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। সে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা ধারালো

ন্যাড়া মাথা লোকটা সায়নকে একটা প্রচণ্ড চড়ে ছিটকে ফেলে দিল··
তারপর ছুরি বার করে মারতে যাবে এমন সময় সুধাময় এসে হাজির

ছুরি বের করছে। জিভে নোনতা স্বাদ, জ্বালা সত্ত্বেও সায়ন বুঝতে পারল, সে মারা যাচ্ছে। এখনই তাকে মেরে ফেলা হবে। এবং সে যতই চেষ্টা করুক, এখান থেকে পালাবার কোনোও পথ নেই।
ঠিক সেই সময় একটা ছায়া ধীরে-ধীরে এগিয়ে এলো কাছে। তারপর গম্ভীর স্বরে কিছু বলতেই, ছুরিধারী মাথা নেড়ে চলে গেল সামনে থেকে। সায়ন ছায়াটাকে নিচু হতে দেখল। এবং তখনই সে দ্বিতীয়বার শিউরে উঠল। সুধাময় সেন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক।"

সায়ন অবাক হয়ে গেল। সুধাময় সেন যে এই গলায় তাকে গালাগালি দেবেন তা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। সুধাময় আবার বললেন। রাগে উত্তেজনায় তাঁর মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছিল। "দুধকলা দিয়ে সাপ পুষে-ছিলাম, না? সেদিন যদি আমি নদীর পাড় থেকে তুলে না বাঁচাতাম, তা হলে তখনই তা ফটাস হয়ে যেতে। তার এই প্রতিদান!"
তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "মৃত্যু তোমার অনিবার্য। আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। এই পাহাড়ে আমার কথাই শেষ কথা।"
সায়নের খুব কান্না পাচ্ছিল। মৃত্যুদণ্ড শব্দটা শোনার পরই তার মনে হচ্ছিল আর বেঁচে থাকার কোনোও সুযোগ নেই। তাদের ঘিরে ন্যাড়া-মাথারা নির্লিপ্ত মুখে খানিকটা তফাতে বসে আছে। পালাবার কোনোও উপায় নেই। সুধাময় সেন বললেন, "কেঁদে কোনোও লাভ নেই! তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। আমাদের একজন লোক কোথায় হারিয়ে গেল বুঝতে পারছি না, অথচ তাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা সে পালন করেছিল। তার ঘোড়া নিয়ে তুমি যে জঙ্গলে চলে এসেছিলে সে প্রমাণ আমার হাতে এসেছে। কিন্তু ঘোড়াটাও তোমার ভুলে বন্যজন্তুর পেটে গেছে। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমার মতো পুঁচকে ছেলে আমাদের ওই লোকটিকে কোথায় সরালে! জবাব দাও।"
সায়নের গলা থেকে শব্দ বের হচ্ছিল না। সে কয়েকবার চেষ্টা করে মাথা

নাড়ল। সেটা দেখে সাগ্রহে সুধাময় সেন প্রশ্ন করলেন, "তুমি জানো, কী হয়েছিল তার?"

সায়ন কোনোওরকমে বলতে পারল, "লোকটা জলে পড়ে গিয়েছিল।"

"এমনি এমনি জলে পড়ে গেল?"

"হ্যাঁ, নদী পার হওয়ার সময় কেউ যেন পেছন থেকে টেনে জলে ডুবিয়ে দিল।"

সুধাময় সেন কথাটা শোনামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সেই দুর্বোধ ভাষায় কিছু বললেন। তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস মেশানো হতাশ শব্দ উঠল।

"কিন্তু তুমি পালাচ্ছিলে কেন?"

"আপনিই তো আমাকে একা রেখে মেলা থেকে চলে গিয়েছিলেন।" যদিও সায়নের গলা কাঁপছিল তবু সে একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছিল।

"আমার দরকারি কাজ ছিল আর সেই সুযোগে তুমি কেটেছ। আমার মতন একজন ভালোমানুষকে তুমি প্রতারিত করেছ!" ঘুরে পা বাড়ালেন সুধাময়।

"আপনি মোটেই ভালোমানুষ নন।"

চমকে ফিরে দাঁড়ালেন সুধাময় সেন, "অ্যাঁ! কী করে জানলে?"

"আপনি নাকি মানুষকে মেরে ফেলতে বলেন। আপনার কথায় এরা দুটো মানুষকে হত্যা করেছে। আপনি এদের দিয়ে আরও অন্যায় কাজ করান।"

"যেমন?"

"এই জঙ্গলে যেখানে বাইরের মানুষ আসতে পারে না সেখানে আপনি কেন বিদেশী জিনিস জমিয়ে রাখেন? কেন গুহার মধ্যে ওইসব রাখেন? নিশ্চয়ই কোনোও অসৎ উদ্দেশ্য আছে। বাবার কাছে শুনেছি, কেউ বিদেশী জিনিস স্মাগলিং করে। আমার মনে হয় আপনি তাই করেন।" গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করল সায়ন।

বাঃ বাঃ, তারপর, আর কী মনে হয় তোমার আমার সম্বন্ধে ?”

আর কী ! ওই ন্যাড়া-মাথা লোকগুলো, ওরা খুব শয়তান। আমাদের চা-াগানের কাছে ওদের দেখেছি আমি। এখন মনে হচ্ছে, ওরাই চা-বাগান-গুলিতে গিয়ে রাত্রে ডাকাতি করে। আর এইসব আপনি করান, এখান থেকে।” সায়নের এখন আর কান্না পাচ্ছিল না। বরং একটা জেদ ক্রমশ ণা তুলছিল।

ীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন সুধাময় সেন, “আমি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তামার মরাই উচিত। এইটুকু ছেলে, এখনও গাল টিপলে দুধ বের হবে, াথচ কেউটের বিষ নিয়ে বসে আছ।”

আমাকে কেউটে বলবেন না, আপনি শয়তান।”

আমি শয়তান,” প্রথমে বিস্ময়, তারপর হো-হো হাসিতে ভেঙে পড়লেন ধোময় সেন, “আমি শয়তান, কী করে বুঝলে ?”

শয়তানেরাই আগুনের সংকেত পাঠায়। আপনি নিষ্ঠুর।”

ও, জেনে গেছ ! না, না, আর দেরি করে লাভ নেই, কী বলো ? আচ্ছা, লো তো, কীভাবে মরলে তোমার ভালো লাগবে ? এই ধরো, এদের যদি লি পাহাড়ের চুড়ো থেকে তোমাকে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে ! বেশ ভাসতে-াসতে কোনোও পাথরে আছাড় খাবে, ব্যস ! নাকি গলায় দড়ি বেঁধে কানোও গাছে ঝুলিয়ে দেব ? বন্দুকের গুলি খরচ করার কোনোও মানে হয় া। উহুঁ, ওরা কেউ একটা ছুরি বসিয়ে দিক তোমার কলজেতে।” কথাটা লে তুড়ি বাজালেন সুধাময় সেন। আর গোল হয়ে বসে-থাকা ন্যাড়া-াথাদের একজন চটপট উঠে এলো কাছে। সুধাময় তাকে সেই ভাষায় কিছু বলতেই সে কোমর থেকে একটা ধারালো ছুরি বের করল।

ায়নের সমস্ত শরীরে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। লোকটা ছুরি বের করে নির্বিকার মুখে শেষ আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে জানে একটুও হাত কাঁপবে না ওর। এই সময় তার মনে পড়ল জিনিসটার কথা। সে একা মরবে না। একবার চেষ্টা করতেই হবে মরার আগে। লোকটা

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তার কাছে আসতে গেলে কয়েক পা হাঁটতে হবেই। সেইটেই হবে তার সুযোগ। এসব ভাবতে দুই মুহূর্তও লাগল না। সুধাময় বললেন, "মরার আগে কিছু বলার থাকলে বলতে পারো।"

ঘাড় শক্ত হয়ে গেল সায়নের। সে মরিয়া হয়ে বলল, "আপনি শয়তান। আপনি কখনওই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ছিলেন না।"

তার চিৎকার ও মুখভঙ্গি দেখে ছুরিধারী এগিয়ে আসছিল, কিন্তু কথাটা কানে যেতেই সুধাময় সেন যেন চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে লোকটিকে থামতে বললেন। সে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল। জ্বলন্ত চোখে সুধাময় সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কী বললে? কী বললে তুমি?"

"ঠিকই বলেছি। সুভাষচন্দ্র বসু মহামানব ছিলেন। তাঁর সঙ্গে যিনি থাকবেন তিনি এমন কাজ কখনই করতে পারেন না।"

সুধাময় সেনকে কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক দেখাল। এইসময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে ন্যাড়া-মাথারা উঠে দাঁড়াল। সুধাময়ও অন্যমনস্কতা সরিয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। দেখা গেল, আর একটা কালো ঘোড়ায় চেপে নতুন ন্যাড়া-মাথা লোক হাজির হলো। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সে চটপট ঘোড়া থেকে নেমে সোজা সুধাময় সেনের সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা সেই অজানা ভাষায় দ্রুত কিছু কথা বলে গেল। শোনামাত্র ন্যাড়া-মাথাদের গলা থেকে চাপা শব্দ ছিটকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠল তারা। সুধাময় সেন একটু বিচলিত হলেন। তিনি লোকটিকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর সঙ্গীদের চাপা গলায় কিছু নির্দেশ দিলেন।

সায়ন বুঝতে পারছিল কিছু একটা হয়েছে। ওই লোকটি এমন খবর এনেছে যা এদের পক্ষে ভালো নয়। ভাষা না বোঝায় সে খবরটা কী তা জানতে পারছিল না। মুহূর্তেই সমস্ত ন্যাড়া-মাথা উধাও হয়ে গেল। শুধু যে লোকটি ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে রয়ে গেল সুধাময় সেনের সঙ্গে

ঘোড়ার পায়ের শব্দগুলো মিলিয়ে যাওয়ামাত্র সুধাময় সেন ঘুরে দাঁড়ালেন, 'এর জন্যেও তুমিই দায়ী। সাপ্লায়াররা খবর পেয়ে গেছে ওদের লোক বেঁচে নেই। আমি জানতাম না শুধু দু'জন নয়, পিছনে আরও একজন ছিল। যে নদী পার হয় নি। এ-পাড়ে পড়ে থাকা মাল সে দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই। তুমিই আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছ। এই মুহূর্তে তোমাকে শেষ করতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে মিথ্যে বদনাম দিয়েছ। জানি না কখনও কাউকে নিজের ভাষায় ওইসব কথা বলার সুযোগ পাব কি না। কিন্তু তুমি যখন কথাটা তুলেইছ, তখন আমার জবাবটা শুনে তবে তোমায় মরতে হবে। কিন্তু এখানে আর আমরা অপেক্ষা করতে পারি না।" সুধাময় সেন লোকটিকে ইশারা করতে সে দুটো ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে এলো। সুধাময় একটায় উঠলেন। সঙ্গী ন্যাড়া-মাথা দ্বিতীয়টায় উঠে এক হ্যাঁচকায় সায়নকে তুলে নিল ওপরে। লোকটার গায়ে এত শক্তি আছে কল্পনা করা যায় না।

লোকটা এখন সামনে, সায়ন পিছনে। ঘোড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীর গা ঘেঁষে চলছে। পিছনে আসছেন সুধাময় সেন। হঠাৎ সায়নের মনে হলো, সে বেঁচে যেতে পারে। কারণ তারা যাচ্ছে নীচের দিকে। এই নদীই তো চা-বাগানের পাশ দিয়ে নেমে গেছে। কিন্তু সেটা কত মাইল দূরে, কে জানে! আর তখনই চোখে পড়ল, পাশের গাছ বেয়ে সেই হনুমানটা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে তাদের পাশাপাশি। চোখাচোখি হতেই হনুমানটা যেন খুশি হলো।

বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর প্রচণ্ড শব্দটা কানে এলো। খুব উঁচু থেকে জল পড়লে এমন শব্দ হয়। এইসব পথঘাট ন্যাড়া-মাথার চমৎকার জানা, সুধাময়েরও, ওদের ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। শব্দটা খুব কাছাকাছি হয়ে গেলে ওরা স্বচ্ছন্দে বাঁ দিকে বাঁক নিল। সায়ন দেখল, এখানে ঝরনার চেহারাটা সরু হয়ে এসেছে। ফলে জল বেড়েছে, স্রোত

কমেছে। কিন্তু সেই জমে-ওঠা জল আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে নীচে। শব্দটা সেই কারণেই। নায়েগ্রা ফল্সের ছবি দেখেছিল সে। তারই একটা ছোট্ট সংস্করণ যেন এটা। ঘোড়াটা যখন বাঁক নিচ্ছে, তখন এক পলকের জন্যে সে দেখতে পেল নীচে পড়ে ঝরনাটা যেন আরোও ছড়িয়ে নদী হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এই নদীটাই তাদের চা-বাগানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সায়ন একবার ন্যাড়া-মাথার লাগাম-ধরা হাতের দিকে তাকাল। কিছুই করার নেই। এদের সঙ্গে সে কোনোওমতেই পেরে উঠবে না। সুধাময় সেন তাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন।

ঠিক সেই সময় মাথার ওপরে একটা যান্ত্রিক শব্দ বাজল। দূর থেকে ছুটে আসছে শব্দটা। সুধাময় সেন চিৎকার করে কিছু বলতেই, ন্যাড়া-মাথা লাফিয়ে নামল ঘোড়া থেকে। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে সায়নকে নামিয়ে ঘোড়া নিয়ে ছুটল জঙ্গলের আড়ালে। সুধাময় তখন একটা পাথরের ওপর উঠে আকাশটাকে লক্ষ্য করে বিড়বিড় করছেন, "হেলিকপ্টার! হেলি-কপ্টার কেন এলো এদিকে?" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সায়নকে দেখে বললেন, "চলে এসো এখানে, এই পাথরটার আড়ালে চলে এসো।"

শব্দটা তখন ঝরনার আওয়াজকে ছাপাতে যাচ্ছে। সায়ন আদেশ পালন করল। সুধাময় তাকে এক হাতে টেনে নিয়ে গেলেন পাথরের আড়ালে। আর তখনই মাথার ওপরে গোঁ-গোঁ শব্দটা চলে এলো। মুখ তুলে সামান্য ঝুঁকতেই সায়ন হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল। এবং তখনই সে বুঝতে পারল, কোথাও যাওয়ার জন্যে ওটা আসে নি। ওরা কিছু খুঁজছে, কারণ, বেশ কয়েকবার একই জায়গায় পাক খেতে-খেতে এগোচ্ছে। একবার যেন একটা লোককে স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এবং তখনই সুধাময় সেনের হাতের বাঁধন শক্ত হলো। ঠিক তখনই ঘোড়ার চিৎকার কানে এলো। ভয় পেয়ে দুটো পা শূন্যে ছুঁড়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো জন্তুটা। মাথা-ন্যাড়া সেটাকে সমস্ত শক্তি দিয়েও স্থির রাখতে পারল না। ঘোড়াটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসছে দেখে হেলিকপ্টারের কথা ভুলে গিয়ে সে ছুটল ঘোড়ার পিছু। দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করলেন সুধাময়। সম্ভবত সেটা

গালাগালি। কারণ, ক্রোধে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই নিষেধটা সম্ভবত ন্যাড়া-মাথার কানে গেল না। সে তখনও চেষ্টা করে যাচ্ছে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে শান্ত করতে। এই সময় হেলিকপ্টারটা নীচে নেমে এলো। সায়ন দেখল, ন্যাড়া-মাথা মুখ তুলে অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে। সুধাময় সেন এবার বাংলায় বললেন, "গর্দভটা সব ডোবাল। দেখতে পেয়ে গেল ওর জন্যে। পাজিটাকে শেষ করতে হবে।"

আরও কয়েকবার পাক খেয়ে হেলিকপ্টারটা আকাশ কাঁপিয়ে ফিরে গেল যেখান থেকে এসেছিল। সুধাময় সেন আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর সেই দুর্বোধ ভাষায় চিৎকার করে উঠতেই লোকটার মুখ থেকে হাসি নিভে গেল। অত শক্তিশালী শরীর থাকা সত্ত্বেও লোকটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তারপর দু'হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল বিড়বিড় করে নিজের ভাষায়। শব্দগুলো না বুঝলেও, অর্থ বোধগম্য হলো। ঘোড়াটার জন্যেই লোকটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। অতএব দোষ যদি কেউ করে থাকে, তা হলে সে নয়, এই ঘোড়াটাই। তারপর মাথার উপর ওই যন্ত্রটা দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ, ওইরকম যন্ত্রকে সে কখনও আকাশে উড়তে দ্যাখেনি। এইটে বুঝতে সময় লাগল। সুধাময় সেন নিজেই বাংলায় চিৎকার করলেন, "প্লেন আর হেলিকপ্টারের পার্থক্য বোঝাতে হবে এখন আমাকে?" লোকটা সত্যি অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। ঘোড়াটা এখন বেশ শান্ত, চুপটি করে তাকিয়ে আছে।

সুধাময় সেন সায়নের দিকে তাকালেন, "আর আমার হাতে বেশি সময় নেই। মনে হচ্ছে ওরা কিছু আন্দাজ করেছে। এই পাহাড়ে কখনওই এইভাবে হেলিকপ্টারের সাহায্যে খোঁজাখুঁজি চলে নি। হয়তো ওরা তোমার সন্ধানে এসেছিল, নয়তো সাপ্লায়াররা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর ওই হাঁদারামটা জানিয়ে দিল, ঘোড়া নিয়ে এই অঞ্চলে কিছু মানুষ লুকিয়ে থাকে! আমাকে এখনই চলে যেতে হবে আরও ভিতরে। তোমাদের দু'জনকে তো আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি না!"

"দু'জনকে ?"

"নিশ্চয়ই। ওই লোকটা শৃঙ্খলা মানে নি। আমার হুকুম ছিল, আকাশে কিছু এলেই সবাই জঙ্গলের আড়ালে চলে যাবে। ও সেই হুকুম মানে নি। তোমাকে যে শাস্তি দেব, ওর ভাগ্যে সেটাই জুটবে। এবার চটপট কথা শেষ করে নিই।" সুধাময় সেন এই অবধি বলে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটা পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে সামান্য সময় চোখ বন্ধ করে বললেন, "আমার সঠিক বয়স কত মনে হয় তোমার ?"

"সঠিক ?"

"বাঙালি ছেলে বাংলা শব্দ বোঝো না ? সঠিক মানে একদম ঠিক।"

"আমি বলতে পারব না।"

"হুঁ! আমিও বলতে চাই না। তবে যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে মেদিনীপুরে খুব আন্দোলন চলছে। ব্রিটিশদের বলা হচ্ছে ভারত ছাড়তে। আমি তখন তরুণ। বাড়িতে খুব অভাব। মা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। বাবাও গেলেন। কাকারা দু'বেলা গালমন্দ করত। শেষ পর্যন্ত বাঁচার তাগিদে পল্টনে নাম লেখালাম। স্বাস্থ্য ভালো ছিল আর পিছুটান ছিল না। তরতর করে উঠে যাচ্ছিলাম। সেই সময় বর্মায় ব্রিটিশরা আমাদের ছেড়ে পালাল। সুভাষচন্দ্র ডাক দিলেন। আর আমরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিলাম। হ্যাঁ, আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিলাম। আমরা যখন সুভাষচন্দ্রের ডাকে দিল্লী দখল করার জন্যে ইম্ফলের দিকে এগোচ্ছি, তখন ব্রিটিশদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে আমাদের দলটা ছড়িয়ে গেল। আমি পথ হারালাম, দলটাকে খুঁজে পেলাম। তোমাকে একদিন এসব কথা বলেছি। পালিয়ে চলে এলাম এখানে। তখনও আমার ধারণা ছিল ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যায় নি। পাহাড়ের গুহায় একদম বনমানুষের মতো লুকিয়ে বাস করতাম। সেই সময় একদিন ওই নদীর ধারে মানুষের চিৎকার শুনতে পেলাম। চিৎকারটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছিল।

আমি জানতাম, এই বিশাল জঙ্গলে, পাহাড়ে আমি ছাড়া আর কোনোও মানুষ বাস করে না। তখন আমি দীর্ঘকাল একা, মানুষের মুখ দেখি নি। তাই চিৎকার শুনে আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে গেলাম গোপন আস্তানা ছেড়ে। গিয়ে দেখলাম একটি বয়স্ক ন্যাড়া-মাথা মানুষ আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার শরীর থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। শকুন, হায়না আর শেয়ালরা চলে এসেছে কাছাকাছি। মানুষটার মাথা ন্যাড়া, গায়ে কালো পোশাক। সেই সময় কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তার। আমি তাকে তুলে নিয়ে এলাম গুহায়। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে কিছু বনজ ওষুধের ব্যবহার শিখেছিলাম। তা ছাড়া আমার ব্যাগে কিছু ওষুধ তখনও অবশিষ্ট ছিল। ভাগ্যই বলতে হবে, মানুষটি সেরে উঠল। আমি তার ভাষা বুঝি না সেও আমার ভাষা বোঝে না। কিন্তু সেরে উঠলেও তার ডান পা চিরকালের মতো খোঁড়া থেকে গেল। প্রায় তিন সপ্তাহ একসঙ্গে থাকার পর আমি তার ভাষা অতি সামান্য হলেও কাজ চালাবার মতো বুঝে নিলাম। এই সময় মানুষটি আমাকে জানাল, পরের পূর্ণিমার আগেই তাকে দলে ফিরতে হবে। কারণ, তার দলের নিয়ম হলো, নেতা যদি মারা যায় বা হারিয়ে যায়, তা হলে পরবর্তী নেতার নির্বাচন পূর্ণিমা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। একবার নতুন নেতা নির্বাচিত হয়ে গেলে পুরনো নেতা ফিরে এলেও তাকে সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই। আমি মানুষটিকে তারই ঘোড়ায় চাপিয়ে নির্দেশ মতো চলতে লাগলাম।”

এই সময় আবার মাথার ওপর গোঁ-গোঁ শব্দ উঠল। দ্রুত নেমে এলেন সুধাময়। তারপর ইশারা করলেন ন্যাড়া-মাথাকে, চটপট আড়ালে যেতে। এবার ন্যাড়া-মাথা ঘোড়াটাকে নিয়ে ছুটে গেল গাছের আড়ালে। পাথরের ধার ঘেঁষে বসে সায়ন আবার হেলিকপ্টারটাকে দেখতে পেল। ওটা ফিরে এসে এখানেই পাক খাচ্ছে। ওরা লোকটাকে দেখেছিল এখানেই। এখন যদি বেরিয়ে হাত নাড়ে সে ? অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল সায়ন। এই

ঘন জঙ্গলে কখনওই হেলিকপ্টার নামতে পারবে না। সুধাময় তার আগেই তাকে শেষ করে ফেলবেন। এত তাড়াতাড়ি মরে যেতে চায় না সে। কোথায় যেন পড়েছিল, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তা ছাড়া সুধাময় সেনের গল্প শুনতে তার খারাপ লাগছে না। হেলিকপ্টারের আওয়াজ কানে নিয়েই সে জিজ্ঞেস করল, "তারপর ?"
সুধাময় অবাক হয়ে গেলেন। চাপা গলায় বললেন, "তোমার ভয় করছে না ?"
"কিসের ভয় ?"
"গল্প শুনতে চাইছ, কিন্তু এই গল্প তো কাউকে শোনাতে পারবে না। ওরা টের পেয়ে গেছে। এগুলো সব মিলিটারিব হেলিকপ্টার। তোমাকে মেরে আমায় চলে যেতে হবে এক্ষুনি।"

সায়ন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি খারাপ লোক ?" খ্যাক খ্যাক করে হাসলেন সুধাময়। শব্দটা যেন জোরে না হয় এ-ব্যাপারে তিনি বেশ সচেতন ছিলেন। তারপর বললেন, "আমি মোটেই ভালো লোক নই। আমি নির্দেশ দিলেই মানুষ মরে। হেলিকপ্টার যতই আমাদের খবর নিক, ইণ্ডিয়া থেকে এখানে উঠে আসার আগে আমরা অনেক সময় পাব। তোমাকে কেন ওই ঘটনাটা বলছি জানো ? এই প্রথম আর এই শেষবার নিজের ভাষায় সত্যি কথা বলার মধ্যে একধরনের আনন্দ হচ্ছে আমার।"
এই সময় হেলিকপ্টারটা বোধহয় হতাশ হয়েই ফিরে গেল ভারতবর্ষে। সুধাময় সেন বললেন, "সংক্ষেপেই বলছি। ওই আহত মানুষটি ছিলেন এক ভয়ঙ্কর বন্য উপজাতি দলের নেতা। এরা দূর দূর পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে লুঠতবাজ করত, কিন্তু কখনওই ভারতবর্ষে প্রবেশ করত না। নেতা দীর্ঘ সময় অনুপস্থিত। এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক। ফলে পরবর্তী নেতা হবার জন্যে একজন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধু নিয়মানুযায়ী তাকে পূর্ণিমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছিল, এই সময় আমাকে নিয়ে মানুষটি তাদের

গোপন আড্ডায় ফিরে আসছিলেন। পথেই নেতা হতে চাওয়া লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে যেন ভূত দেখল, তারপর প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষটির ওপর। দুর্বল এবং পঙ্গু মানুষটি তৎক্ষণাৎ মরে যেতেন, যদি আমি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে না যেতাম।

"ইতিমধ্যে দলের অন্যান্যরা ছুটে এসেছিল। ক্ষমতালোভী লোকটিকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হলো। নেতা তার দলের মানুষদের আমার কথা জানাল। আমার জন্যেই দু'বার প্রাণ রক্ষা হয়েছে তার। আমাকে যেন দলের সবচেয়ে সম্মানযোগ্য মানুষ হিসেবে সবাই দ্যাখে। নেতাকে সবাই খুব ভালোবাসত। তার কথা মেনে নিল সবাই। নেতার কোনোও সন্তান ছিল না। আমার ওপর তার স্নেহ আমাকে শক্তিশালী করে তুলল। আমি দেখলাম, এরা বেশ পটু অশ্বারোহী। তলোয়ার এবং তীর ছুঁড়তে খুবই দক্ষ। কিন্তু কোনোও শিক্ষিত বুদ্ধির সংস্পর্শে আসে নি। আমি ওদের গেরিলা ট্রেনিং দিতে শুরু করলাম। ক্রমশ ওদের ভাষা আমি রপ্ত করে নিলাম। আমার মাথায় তখন অন্য পরিকল্পনা কাজ করছিল। এই দল ব্রিটিশদেব তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু অতর্কিত হানা দিয়ে আমি ব্রিটিশদের বিব্রত করতে পারি। তবে শুধু তলোয়ার আর তীর-ধনুক নিয়ে সেটা কতটা কার্যকর করা যাবে, তাই নিয়ে সন্দেহ ছিল। আমি ওদের লোভ দেখালাম। শুধু গরিব পাহাড়ি গ্রামে লুঠতরাজ করে কী লাভ, সমতলে গেলে অনেক বেশি জিনিস পাওয়া যাবে। ওরা প্রথমে ভয় পেল। কখনওই পাহাড় ছেড়ে নীচে নামে নি ওরা। সমতলে গেলে ফিরবে না বলে একটা প্রবাদ চালু ছিল এখানে। অনেক চেষ্টার পর আমি এদের রাজি করালাম। কিন্তু তখন আমারই সঠিক ধারণা ছিল না, ভারতবর্ষ ঠিক কতটা দূরে।"

এই অবধি বলেই সুধাময় সেন মাথা নাড়লেন, "বড্ড সময় নিচ্ছি। এত কথা বলার কোনোও দরকার নেই। আক্রমণ শুরু করার আগে পথ চিনতে ওই নদী ধরে আমরা নীচে নেমেছিলাম। প্রথমবার অনেক সময় লেগে-ছিল। তারপর সহজ রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি ভারতবর্ষের এত

কাছাকাছি বছরের পর বছর লুকিয়ে ছিলাম অথচ জানতেই পরি নি। সঙ্গীদের বনের সীমান্তে রেখে আমি নিজে একটা বাজার মতো এলাকায় নামলাম। সেদিন সেখানে হাট বসেছিল। আমাকে হয়তো ভিখিরির মতো দেখাচ্ছিল, কিন্তু কেউ কোনোও প্রশ্ন করে নি। আমি অবাক হয়ে শুনলাম ব্রিটিশরা চলে গেছে। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর নাম জওহরলাল নেহরু। এত আনন্দ হলো যে কী বলব। কিন্তু তখনই পুলিশ আমাকে ধরল। থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় বাড়ি, কেন সেখানে এসেছি। আমি তাদের সব কথা বলেছি কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। আমাকে ওরা বিদেশী চর ভাবল। মুখ থেকে কথা বের করতে মারধোর করল।

"ভোরবেলায় সুযোগ পেয়ে পালালাম। সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসতেই ওরা অবাক হয়ে গেল। আমার তখন ক্রোধে দিশেহারা হবার অবস্থা। যে ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে আমরা সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, তারাই আমাকে এমন হেনস্থা করল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম থানায় মাত্র পাঁচজন পুলিশ এবং তারা খুবই অলস ও বিলাসী। কিছু আগ্নেয়াস্ত্র নজরে পড়েছিল। সেই ভোরেই আমি সঙ্গীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম থানায়। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দারোগার ওপর প্রতিশোধ নিয়ে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র দখল করে নিয়ে গেলাম জঙ্গলে। সেই থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার সমস্ত দুর্বলতা চলে গেল। তারপর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো এমন একটা দলের, যাদের কাছ থেকে আমরা আধুনিক অস্ত্র পেলাম। বিদেশী দামি জিনিসপত্র চালান দেবার কাজ হাতে নিলাম আমি। কেন নিলাম সে কৈফিয়ত আজ দেব না। কিন্তু আমি কখনওই সামনে যেতাম না। দলের সঙ্গে থাকতাম না। অশক্তদের বাদ দিয়ে বিশ্বাসী মানুষদেব নিয়ে সুসংবদ্ধ দল গড়ে তুললাম। নেতা মারা যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, যেন আমাকেই নেতা হিসেবে সবাই গ্রহণ করে। ওরাও বুঝেছিল আমি দলে আসার পর তাদের সবকিছুই পালটে গিয়েছে। অনেক

বেশি সমৃদ্ধশালী হয়েছে ওরা। আধুনিক অস্ত্র-ব্যবহারে পটু হয়েছে।
"হ্যাঁ, আমার দলের মাধ্যমে নেপাল এবং চীন থেকে চোরাচালান যায় ভারতবর্ষে। লক্ষ লক্ষ টাকা জমা আছে আমার কাছে। কিন্তু সেটা ব্যবহার করার কোনোও সুযোগ নেই। কিন্তু এখন এটা নেশার মতন দাঁড়িয়ে গেছে। আর আমারই হাতেগড়া দলটা যে স্বাদ পেয়েছে তা আমি চাইলেও পালটানো যাবে না। ব্যাপারটা বন্ধ করতে চাইলে ওরা অবাধ্য হবে। কিন্তু এখনও চোখ বন্ধ করলে আমি সেই রাতটাকে দেখতে পাই। থানায় ওরা আমাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করেছিল, মেরেছিল। তাই আমি এতদিন পরে হানা দিচ্ছি ভারতবর্ষে। আমার লোক রয়েছে নীচে। তাদের আগুনের সংকেতে বুঝিয়ে দিই কী করতে হবে। কিন্তু তুমি আমার অমঙ্গল বয়ে নিয়ে এলে। তুমি আসার পর থেকেই অশুভ ব্যাপারগুলো শুরু হয়ে গেছে। সাপ্লায়াররা আমাদের টপকাতে চেয়েছিল এবার, হেলিকপ্টার তল্লাশি চালাচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে তোমার জন্যে। তুমি আমাদের কালগ্রহ।" কথাগুলো বলতে বলতে কোমর থেকে একটা কুচকুচে কালো ছোট্ট পিস্তল বের করলেন সুধাময় সেন। তাঁকে এখন প্রচণ্ড রাগী বলে মনে হচ্ছিল। রক্তশূন্য হয়ে গেল সায়ন। পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে সে কাঁদতেও ভুলে গেল। সুধাময়ের আঙুল ট্রিগারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে. ঠিক তখনই আচমকা সুধাময় ঘুরে দাঁড়ালেন, যেদিকে ন্যাড়া-মাথা ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বিস্মিত হবার আগেই শব্দটা বাজল। প্রচণ্ড বিস্ময় এবং যন্ত্রণায় ন্যাড়া-মাথা দুটো হাত আকাশে ছুঁড়ল। তার বুকের ওপর চলকে উঠল রক্ত। একটা পাক খেয়ে লোকটা ঢলে পড়ল মাটিতে। হো-হো করে হেসে উঠলেন সুধাময় সেন। তারপর চট করে হাসি থামিয়ে বললেন, "এই লোকটা লোভী হয়ে উঠেছিল। দলের মধ্যে আমার সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করছিল। ও ইচ্ছে করেই হেলিকপ্টার দেখেও বেরিয়ে এসেছিল, যাতে আমি বিপদে পড়ি। সাপকে বড় হতে দিতে নেই।"
লম্বা পা ফেলে সুধাময় সেন এগিয়ে গেলেন লোকটার মৃতদেহের দিকে।

তারপর ঝুঁকে ওর কোমরের বেল্ট খুলে রিভলভার আর গুলির বাক্স বের করে বললেন, "একটা কারণ দেখাতে হবে শব্দটার জন্যে। না, শব্দটা নয়, দুটো শব্দ, আর-একটা একটু পরেই হবে। বলতে হবে তুমি একে খুন করেছ আর তাই তোমাকে শেষ করতে হলো আমাকে।" রিভলভার থেকে গুলি বের করে সুধাময় ওটা ছুঁড়ে দিলেন সায়নের দিকে, "ওটা তুলে নাও। নাও বলছি।" গলায় ধমক বাজল।

সায়ন রিভলভারটা তুলে নিল। এটার কোনোও মূল্য নেই। সুধাময় আবার ঝুঁকে লোকটাকে উলটে দিলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার পকেট দেখতে। এই সময় তাঁকে উন্মাদের মতো দেখাচ্ছিল। সায়ন তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল নীচে; কোনোওদিকে না তাকিয়ে ছুটে যাচ্ছিল নদীটার দিকে। এই সময় সুধাময় সেনের চিৎকার ভেসে এলো! তিনি তাকে ক্রুদ্ধ গলায় থামতে বলছেন। আচমকাই পাহাড়টা শেষ হয়ে গেল সায়নের সামনে। এখান থেকে অনেক নীচে সটান নেমে গেছে পাহাড়টা। পিছন ফেরার উপায় নেই। কারণ সুধাময়ের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর তখনই একটা গুলির শব্দ হলো। অবাক হয়ে সায়ন দেখল তার মাথার ইঞ্চি দুয়েক ওপাশে একটা গাছের বাকল খসে পড়ল। না, আর কোনোও উপায় নেই। এই সময় আবার হেলিকপ্টারের আওয়াজ উঠল। সায়ন চট করে গাছের আড়ালে চলে গেল। আর ঠিক তখনই তার খেয়াল হলো, সেই সাপের কামড়ে মরে যাওয়া লোকটার রিভলভারটার কথা। এটার অস্তিত্ব সুধাময় জানেন না। এবং তখনই সুধাময় সেনকে দেখল সে। পাগলের মতো হো-হো করে হাসছেন। হাতে পিস্তলটা। সুধাময় অদ্ভুত গলায় বললেন, "কোথায় পালাবি। এইবার তোকে মারব। না, পিস্তলে নয়। গুলির দাম অনেক।" বলতে বলতে পিস্তলটাকে আবার কোমরে গুঁজলেন তিনি, "তোকে এই দু'হাতে গলা টিপে মেরে নীচে ছুঁড়ে দেব। নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চলে যাবি।"

ওই বিকট চেহারার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সায়ন, "আপনি

রিভলভারটা সুধাময়ের দিকে তুলে ধরল সায়ন

শয়তান।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি শয়তান। আমার চোখ এড়িয়ে পালাবি এত সাহস তোর!'

দুটো হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছিলেন সুধাময় সেন। আর তখনই গুলিভরা রিভলভারটা বের করল সায়ন। সে জানে না গুলি বের হবে কি না। কখনও রিভলভার ছোঁড়ে নি সে। ওটা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লেন সুধাময়, "গুলি ছাড়া রিভলভার আমার দিকে তাক করেছিস, হা-হা-হা।"

আর তখনই ওপরের দিকে মুখ করে রিভলভারের ট্রিগার টিপল সায়ন প্রচণ্ড শব্দে গুলিটা ছিটকে গেল, আর হাতটা কেঁপে উঠল সায়নের সঙ্গে-সঙ্গে পাথর হয়ে গেলেন সুধাময় সেন। বিস্ময়ে তাঁর মুখ পালটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল সায়ন। চিৎকার করে বলল "হাত নামাবেন না। গুলি আছে কি না সেটা তা হলে বুঝতে পারবেন।"

সুধাময় ভীত গলায় বললেন, "ওটা নামাও। আমি তোমাকে মারব না কথা দিচ্ছি, এতক্ষণ ভয় দেখাচ্ছিলাম। গুলিভরা রিভলভার তুমি কোথায় পেলে?"

মাথা নাড়ল সায়ন, "আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি শয়তান ওই অবস্থায় ঘুরে দাঁড়ান। হ্যাঁ, এইবার এগিয়ে যান সামনে। অন্য কিছু করলেই কিন্তু গুলি করব।"

দুটো হাত মাথার ওপরে, সুধাময় বাধ্য হলেন খোলা জায়গায় হেঁটে আসতে। তাঁর কিছুটা তফাতে সায়ন। তার হাতে রিভলভারটা কাঁপছে কিন্তু সেই সময় হেলিকপ্টারটা নেমে এসেছে নীচে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর তল্লাশকারীরা দেখতে পেয়েছেন তাদের। তারপর হেলিকপ্টারটা মাথার ওপরে স্থির হলো। সায়ন দেখতে পেল, একটা দড়ির সিঁড়ি নেমে আসছে ওপর থেকে। আর তখনই বাবার মুখ দেখতে পেল সে। হেলি-কপ্টারের দরজায় ঝুঁকে তিনি চিৎকার করলেন, "খোকা, ওইভাবে থাক, আমরা নেমে আসছি।"